চেতনার আলোকে

মীরা দেবী

ছোট বহেড়া, হুগলী

প্রথম প্রকাশ
১৫ মাঘ, ১৩৬০

প্রকাশক
সুতপা দাস
ছোট বহেড়া, হুগলী
৭১২২৪৬

অক্ষর বিন্যাস
দি ডি-কমলেসার
৬০ সিকদার বাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০০৪

মুদ্রক
শ্রীদুর্গা প্রেস
৭৩এ, আমহার্স্ট রো
কলকাতা ৭০০০০৯

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যভাব

ঠাকুর বলেছেন, "প্রথমে প্রবর্তক। সে পড়ে শুনে। তারপর সাধক তাঁকে ডাকছে, ধ্যান চিন্তা করছে, নাম গুণ কীর্তন করছে। তারপর সিদ্ধ—তাঁকে বোধ করছে, দর্শন করছে। তারপর সিদ্ধের সিদ্ধ, যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব।" বাৎসল্যভাবে গোপাল থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই আবার একসময় গোপাল হয়ে ধরা দিলেন।

এটা সেই ১৮৬৪ সালের ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরে হাজির হলেন জটাধারী নামে এক রামভক্ত। এই জটাধারীর ঝোলার মধ্যে আছে শিশু রামচন্দ্রের এক গোপাল মূর্তি। অষ্টধাতুর নির্মিত এই ছোট বিগ্রহটি। এটি জটাধারীর রামলালা। এই বিগ্রহটির সেবা পূজা করে ঐ জটাধারী থাকতেন তন্ময়। এটি ঠাকুরের নজরে আসে। ঠাকুর সবই বুঝলেন তাই বাৎসল্য রসের ভাবঘন অনুভূতিতে নিজের হৃদয় ভরে নিলেন।

এবার শুরু হল এক বিপত্তি। ঠাকুর যতক্ষণ জটাধারীর কাছে বসে থাকেন রামলালাও ততক্ষণ সমানেই খেলা করে। কিন্তু ঠাকুর যখন নিজের ঘরে চলে আসেন রামলালাও পিছু পিছু এসে হাজির হয় ঠাকুরের ঘরে। জটাধারী তাঁর অতিপ্রিয় রামলালার ব্যবহারটি লক্ষ্য করে বুঝলেন যে রামলালা আর তাঁর কাছে থাকতে চাইছে না। ঠাকুরের অত্যধিক বাৎসল্য রসে আকৃষ্ট হয়ে রামলালা চলে যেতে চাইছে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। তাই জটাধারী তাঁর পরমপ্রিয় রামলালার সন্তুষ্টির জন্য চোখের জলের সঙ্গে রামলালাকে ঠাকুরের হাতে অর্পণ করে চলে যান।

রামলালাকে নিয়ে চলল ঠাকুরের আর এক অভিনব লীলা খেলা। রামলালা সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন "দেখতুম, সত্যি সত্যি দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখনো আগে কখনো পেছনে নাচতে নাচতে আসছে। কখনো বা কোলে ওঠবার জন্য আবদার করছে। আবার হয়তো কখনো বা কোলে করে রয়েছি; কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে।" বাৎসল্য রসে বিগলিত ঠাকুর তাকে মানা করেন, "ওরে, অমন করিসনি, গরমে

পায়ে ফোস্‌কা পড়বে! ওরে অত জল ঘাঁটিসনি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে।” কিন্তু দুষ্টু রামলালা ঠাকুরের মানা শুনতো না। পদ্মের পাপড়ির মতো দীঘল টানা চোখ দুটি দিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিকে চেয়ে থাকত আর দুষ্টামির হাসি হাসত। কিন্তু যতদিন যেতে থাকে রামলালার দুরন্তপনা বেড়েই চলল। তার দুরন্তপনায় একদিন তিনি সত্যিই রেগে গিয়ে বললেন, “তবে রে পাজি, রোস্‌—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।”

আর একদিনের ঘটনা। রামলালা ক্ষিদে পেয়েছে বলে খুব বায়না করছে। ঠাকুর তাকে কোলে নিয়ে আদর করে খই খেতে দিয়েছেন। খইয়ের সঙ্গে ধান ছিল। রামলালার কচি মুখে ধান লাগল আর ধানের আঘাতে তার কচি জিভ কেটে গেল। সেই দেখে ঠাকুরের হৃদয় কেঁদে উঠল। এই রামলালার মুখে একদিন অযোধ্যার মহারাণী কৌশল্যা দিয়েছেন রাজবাড়ির কত ক্ষীর, ননী ও ছানা, আর সেই রামলালাকে ঠাকুরের হাতে পড়ে খেতে হল ধান মেশানো খই। তাই অনুতপ্ত ঠাকুর এক দৃষ্টে চেয়ে থাকেন রামলালার মুখের দিকে আর তাঁর দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা।

ঠাকুরের বাৎসল্য ভাব এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে তিনি ভবতারিণী মায়ের কাছেও প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন, “ওমা ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নে মা। ব্রহ্মজ্ঞান চাইনে মা। আমি আনন্দ করবো, বিলাস করবো! কৃষ্ণরে! তোরে বলবো; খারে, নে রে—বাপ। কৃষ্ণরে! বলবো তুই আমার জন্যে দেহ ধারণ করে এসেছিস বাপ।”

ঠাকুরের বাৎসল্য রস আবার দেখতে পাই রাখালকে পাবার সময়। এই সময় কিছু দিন ধরেই আপন মনে সর্বদাই বিড়বিড় করেছেন, ‘হে মা! জগদম্বে, তুই আমাকে আর একলা রাখিস নে। আমাকে একটা নিত্যসঙ্গী দে, যাকে আমি চান করাবো, খাওয়াবো, পরাবো।” এই বাৎসল্য রসের আবেগ ক্রমশঃ গাঢ়তর থেকে হয় গাঢ়তম। ঠাকুরের আবেগ আর আশা দিন দিন যায় বেড়ে । এই সময় একদিন ভাবচক্ষে ঠাকুর দেখতে পেলেন মন্দিরের বাগানে বটতলাতে একটি ফুটফুটে শিশু তাঁর দিকে চেয়ে দুইহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এর কিছুদিন পরেই ঠাকুর মানসচক্ষে দেখলেন এক অভাবনীয় দৃশ্য। ঢেউ মেখলা গঙ্গার বুকে ভেসে আসছে একটি সুন্দর পদ্ম, তার মধ্যে খেলা করছে দুটি শিশু, একজন নূপুর পায়ে বংশীধারী রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ অপরজন তাঁরই সঙ্গী। দুইটি শিশুর মধ্যে কি যেন এক মমত্ববোধ পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। ঠিক সেই সময় মনোমোহন হাজির করলেন রাখালকে ঠাকুরের সামনে। রাখালকে দেখেই ঠাকুরের চোখে মুখে দেখা গেল পরিতৃপ্তি। ঠাকুর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বলতে শুরু করলেন এই তো সেই , যাকে তিনি একটু আগে

দেখেছেন রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতে। ঠাকুর বারবার বলতে লাগলেন, "এই তো আমার রাখালরাজের সঙ্গী রাখাল।" এই রাখালকে কেন্দ্র করেই ঠাকুরের বাৎসল্য ভাব সাধনা অগ্রগতি লাভ করেছিল।

তখন রাখালের এমন ভাব ছিল যেন চার বছরের শিশু। মাঝে মাঝে রাখাল ঠাকুরের কোলে বসে মনের আনন্দে খেলা করতো। শুধু তাই নয় রাখাল নিঃসঙ্কোচে ঠাকুরের স্তন পানও করতো। ঠাকুর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতেন তার সর্বাঙ্গে। সময় সময় ঠাকুর তাকে আদর করে ডাকতেন, "আয় আয়, তুই আমার রাখাল, তুই আমার গোপাল, তুই আমার কৃষ্ণ।" আর ভাবাবিষ্ট হয়ে তিনি ক্ষীর ননী ও ছানা তার মুখে তুলে দিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েক বছর পরে রাখাল একবার বৃন্দাবনে যায়। কিন্তু রাখালের প্রতি বাৎসল্য রসে ঠাকুর এতই ভরপুর যে তিনি রাখালের বৃন্দাবন যাত্রার মধ্যেও এক অজানা আশঙ্কা বোধ করতে লাগলেন। স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁর সন্তানের কাল্পনিক বিচ্ছেদের আশঙ্কায় সর্বদা থাকেন তটস্থ তেমনি ঠাকুরও রাখালের কাল্পনিক বিচ্ছেদে হয়ে উঠেছিলেন চঞ্চল ও অস্থির। বাৎসল্যরসের প্রাধান্যেই ঠাকুরের মধ্যে এই অলীক বিচ্ছেদের আশঙ্কা দানা বেঁধে উঠেছিল।

দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন এক প্রৌঢ়া। বসে আছেন ভক্ত জনের মধ্যে, নাম অঘোরমণি। কিন্তু মনের মণিকোঠায় কার ঘোরে অঘোর হয়ে আছেন, এই অঘোরমণি? এই ঘোর গোপালের ঘোর। গোপালের ঘোরে বিভোর এই অঘোরমণি।

ত্রয়োদশী কিশোরী অঘোরমণি হয়েছিলেন বালবিধবা নিঃসন্তান অবস্থায়। স্বামী যে কি বস্তু না পারলেন জানতে না পারলেন চিনতে। একটা সন্তান থাকলেও তার হাত ধরে জীবন কাটাতে পারতেন। তাই পরে এই কিশোরী দীক্ষা গ্রহণ করেন গোপাল মন্ত্রে আর শিশু কৃষ্ণ এই নিঃসন্তানা বিধবার হয় একমাত্র সম্বল। তাই গোপাল ঘোরে বিভোর এই অঘোরমণি।

ঠাকুর কিন্তু বুঝেছিলেন অঘোরমণির ব্যথা। তাই সেদিন তিনি অঘোরমণিকে ডেকে বললেন, "দাও মা, তোমার আঁচলের তলায় যা লুকিয়ে রেখেছো।" অঘোরমণি লজ্জায় আড়ষ্ট। কারণ তাঁর হাতের মুঠোয় আছে সস্তা দামের সন্দেশ। আর তিনি নিজের চোখে দেখছেন ঠাকুরের সামনে বসানো রয়েছে অন্যান্য ভক্তদের আনা তবকে রাংতায় মোড়া দামী সন্দেশ। বড় মুস্কিলে পড়েছেন এই অঘোরমণি। ঠাকুরও বুঝেছেন অঘোরমণির ইতঃস্তত করার কারণ। তাই তিনি আবার বললেন, "দাও মা দাও, খাই আমি।" ঠাকুর তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে বললেন, "তুমি সন্দেশ কিনেছো কেন? তুমি যা রাঁধবে তাই নিয়ে আসবে।"

অঘোরমণি বললেন যে তিনি তো কাঙালিনী চির দুঃখিনী। তাঁর শাকপাতা সেদ্ধ খেয়ে দিন চলে যায়। ঠাকুর এই কথাটি লুফে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ছেলে খেতে চাইছে মায়ের কাছে, মায়ের যা জুটবে ছেলে তাই খাবে, এটাই তো ছেলের ব্যাপার।"

বাড়ি ফিরে সেই রাতে অঘোরমণি দেখেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর পাশে বসে খাবার চাইছেন। কিন্তু এই অঘোরমণির অবাক হওয়া তখনও বাকী ছিল। ভালো করে যখন দেখলেন তখন দেখতে পেলেন এতো সেই একমুখ দাড়ি সমেত রামকৃষ্ণ নয়, গোপালের মতই নধরকান্ত দশমাসের একটি শিশু। আর হাত তুলে অঘোরমণির দিকে চেয়ে আছে। তখন গোপাল আর রামকৃষ্ণ অঘোরমণির কাছে এক হয়ে গেছে।

গোপালরূপী রামকৃষ্ণ বলছেন, "দাও মা, আমায় ননী দাও।" 'ননী' এই কথা শুনে অঘোরমণি কেঁদে উঠলেন। ননী কোথায় পাবেন? অঘোরমণির কাছে আছে তখন বাসি নাড়ু। তাই তিনি দিতে চাইছেন না গোপালরূপী রামকৃষ্ণের হাতে।

গোপালরূপী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার তাগাদা দেন, "আমায় বাসি নাড়ু দাও, পেটে ক্ষিদে থাকলে বাসি টাটকা কোন ভেদ থাকে না। ছেলে খেতে চাইছে মায়ের কাছে এতে আবার টাটকা বাসি কথা কেন? সন্তান বিরহে যে মা উপবাসী তার সঞ্চিত স্নেহ কখনও কি বাসি হতে পারে?

অঘোরমণি গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে প্রাণ ভরে খাওয়ালেন আর কাঁদলেন মনের আনন্দে। পরের দিন পাগলিনী প্রায় অঘোরমণি এসে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "গোপাল আমার, গোপাল আমার, আর ঠাকুর বললেন, "তুমি তো গোপালের মা।" সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তাই যে রামকৃষ্ণ একদিন রামলালাকে ভালবেসে বাৎসল্য রস আস্বাদন করেছিলেন সেই রামকৃষ্ণই আজ অঘোরমণিকে বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধ বারিতে স্নান করিয়ে গোপালের মা করে দিলেন।

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের অক্ষরজ্ঞান

যিনি যত বই পড়েছেন আমরা তাঁকে ততবেশি পণ্ডিত মনে করি, জ্ঞানী মনে করি। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীগুলোর লেজুড় যাঁর যত বড় তিনি তত বেশি জ্ঞানী বা মহাজ্ঞানী। আর যাঁদের এগুলো নেই তাঁদের আমরা মূর্খই বলি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আমরা কি ভূষণে ভূষিত করব?

ঠাকুরের পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। এমনকি, তাঁর অক্ষর জ্ঞানও ছিল কিনা, এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। এমনকি স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ এবং তৎকালীন কিছু জীবনীকারগণও ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর যৎসামান্য অক্ষরজ্ঞান ছিল, কোনোরকমে হয়তো নামটি লিখতে পারতেন।" এখন আলোচনা করা যাক প্রকৃত ঘটনাটি কি?

বিদ্যাভ্যাস করার জন্য বালক গদাধরকে পিতা ক্ষুদিরাম নিজেই পাঠশালায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন—"সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং পাঠশালায় পাঠাইতে লাগিলেন।" (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ)

কামারপুকুর গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের নাটমণ্ডপে বসতো পাঠশালা সকালে, বিকালে। এই পাঠশালাতেই গদাধর বিদ্যারম্ভ করেন। পাঠশালায় পড়া কিছুটা তাঁর হয়েছিল। তবে অঙ্কতে তাঁর আকর্ষণ ছিল না। যদিও তাঁর মেধা ও স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, শুধুমাত্র আকর্ষণহীনতার জন্যই তিনি ছিলেন অঙ্কতে কাঁচা। তবে তিনি শ্রুতিধর, তাই পাড়ার যাত্রাগানের-আসর, বিভিন্ন পালা ও রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন অংশ শুনে শুনেই তিনি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন।

ঠাকুরের বাল্যকাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'লীলা-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, সেই ছেলেবেলাতেই ঠাকুর এমন সুন্দর ভাবে রামায়ণ, মহাভারত বা প্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ করতেন যে, গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা তা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেত। এই রামায়ণ-মহাভারত শুধু পাঠ নয়, সেগুলির অনুলিপি করাও সেকালে বিদ্যাচর্চার অঙ্গ রূপে পরিগণিত হত। "প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করে কিশোর শ্রীগদাধর কয়েকটি পুঁথির অনুলিপি করেছিলেন। কালসূর্য্যের ভক্ষণ

অতিক্রম করে যে কয়টি পুঁথিপত্র আজও অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান, সুনিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করবে কিশোর শ্রীগদাধরের বিদ্যাচর্চার প্রতি নিষ্ঠা।"

শ্রী অক্ষয়কুমার সেন, রামচন্দ্র দত্ত ও স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের কর্ম জীবন সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত কতকগুলি পুঁথির সন্ধান পান। সেগুলি হল, 'মহীরাবণের পালা', 'সুবাহুর পালা', 'হরিশ্চন্দ্রের পালা', 'যোগাদ্যার পালা' ও 'রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি'।

উদ্বোধন পত্রিকার ফাল্গুন ১৩১১ সংখ্যার ৬৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের হস্তলিপির কিছু আলোকচিত্র ছাপা হয়েছিল। এবং এই আলোকচিত্রগুলি প্রমাণ করে যে শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তাক্ষর ছিল অতীব সুন্দর।

এই প্রসঙ্গে স্বামী প্রভানন্দের ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপর আলোচনার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—"প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই ধরণের পুঁথি লেখা শুধুমাত্র লেখার কাজ নয়, চারুশিল্প ও বটে। আমাদের স্বভাব শিল্পী শ্রীগদাধর তাঁর পুঁথিপাটাকে সজ্জিত করেছিলেন সুরুচিসম্পন্ন ছোটখাটো নক্সার সাহায্যে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের লেখাপড়ার কথা উঠলে নিজেই রহস্য করে বলতেন, "আরে আমি তো মূর্খোত্তম।" আবার বলতেন, "কি আশ্চর্য আমি মূর্খ, তবু এত লেখাপড়া জানা লোক এখানে আসে।"

'মূর্খ' কথাটি নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করলেও লৌকিক বিদ্যাহীন লোককে তিনি কখনই মূর্খ বলতেন না।

ঠাকুরের কাছে জ্ঞান ছিল ঈশ্বর জ্ঞান। তিনি বিশ্বাস করতেন লৌকিক বিদ্যাতে মান, যশ ও অর্থ অর্থাৎ জাগতিক অনেক কিছু হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু তার দ্বারা ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে না। আর মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু হল ঈশ্বর প্রাপ্তি। তাইই যদি না হয় তবে এ বিদ্যার কি প্রয়োজন?

জ্ঞান ও অজ্ঞান সম্পর্কে মাস্টারের (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথনের উদ্ধৃতিটা এখানে দেওয়া হল এবং এই উদ্ধৃতিটাই এ বিষয়ে ঠাকুরের মনোভাবের সম্যক্ পরিচয়।

......." আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যা শক্তি?"

মাস্টার—আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হইয়া)— আর তুমি জ্ঞানী? তিনি (মাস্টার) "জ্ঞান কাহাকে বলে, অজ্ঞান কাহাকে বলে, এখনও জানেন না। এখন এই পর্যন্ত জানিতেন যে, লেখাপড়া শিখিলে ও বই পড়িতে পারিলে জ্ঞান হয়। এই ভ্রম পরে দূর হইয়াছিল। তখন শুনিলেন যে, ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না জানার নামই অজ্ঞান। ঠাকুর বললেন—"তুমি কি জ্ঞানী?" মাস্টারের অহঙ্কারে বিশেষ আঘাত লাগিল।"

"ঠাকুর যে বই পড়েন না, বৃন্দেঝিও মাস্টারকে জানায়। এই মাত্র ধুনা দেওয়া হইয়াছে। মাস্টার ইংরেজী পড়িয়াছেন, ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে পারিলেন না। দ্বারদেশে বৃন্দে (ঝি) দাঁড়াইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?"

বৃন্দে—হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন। মাস্টার—ইনি এখানে কতদিন আছেন? বৃন্দে—তা অনেক দিন আছেন—

মাস্টার—আচ্ছা, ইনি কি খুব বই-টই পড়েন? বৃন্দে—আর বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে! মাস্টার সবে পড়াশুনা করে এসেছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বই পড়েন না শুনে আরও অবাক হলেন।"

এখন এটা প্রশ্নাতীতভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, ঠাকুর বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর লাভের বিদ্যা ছাড়া সব বিদ্যাই অসার। এমন কি তিনি বিদ্যাসাগরকেও বলেছিলেন, "আপনি সব জানেন তবুও খপর নেই।" এই 'খপর নেই' কথার তাৎপর্য সম্ভবত ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিশেষ উপলব্ধি নেই।

প্রচলিত বিদ্যায় অদক্ষ হয়েও ঠাকুর রামকৃষ্ণ শাস্ত্র আলোচনায় অনেক গভীরতা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। "অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু! (সকলের হাস্য)। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বললে, মহাশয়! আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে সব পড়া বিদ্যা সব থু হয়ে গেল! এখন বুঝেছি, তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না, মুখ্যু বিদ্বান হয়, বোবার কথা ফোটে! তাই বলছি, বই পড়লেই পণ্ডিত হয় না।"

ঠাকুর কোন গ্রন্থপাঠ করেননি বললেই হয়। গ্রন্থকে তিনি কখনও কখনও 'গ্রন্থি' বলে রসিকতা করতেন। তাঁর ভাষায় অনেক সময় গ্রন্থ পাঠ মানুষকে তথাকথিত পণ্ডিত ও আত্ম অহংকারী করে তোলে। তাই গ্রন্থ তথা গ্রন্থি মানুষের মনকে আবদ্ধ করে দেয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি ঠাকুরের, পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও অক্ষর জ্ঞান অবশ্যই ছিল। আর একদিকে বলা যায় অক্ষর শব্দের অর্থ 'ব্রহ্ম'। তাই যে মানুষের ব্রহ্ম জ্ঞান থাকে সেই মানুষ নিরক্ষর হতে পারেন কি করে!

ঠাকুরের সহধর্মিণীরূপে সারদা দেবী

সহধর্মিণী অর্থ যিনি স্বামীর ধর্মকেই নিজের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। স্ত্রী হলেই যে স্বামীর সহধর্মিণী হবে তার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। অর্থাৎ স্বামীর জীবনাদর্শকে যিনি গ্রহণ করতে পারেননি তিনি স্ত্রী হলেও সহধর্মিণী নন। অর্থাৎ সার্থক সহধর্মিণী স্বামীর ধর্মকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা দেবেন। সেদিক দিয়ে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের সার্থক সহধর্মিণী। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশাতে তো বটেই, তাঁর অন্তর্ধানের পরেও সারদাদেবী ঠাকুরের আরব্ধ কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের প্রতিটি ক্ষণ-অনুক্ষণ মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত ছিলেন।

বিভিন্ন যুগে ভগবানের অবতার রূপে যাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন এই মর্ত্যধামে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীগৌরাঙ্গ, — শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদেরই উত্তর প্রকাশ। ভগবানের মর্ত্যলীলার সনাতন রীতি হল এই যে, যখনই ভগবান আসেন সঙ্গে আসতে হয় তাঁর শক্তিকেও। তাই দেখা যায় যে রামের সীতা, কৃষ্ণের রাধা, বুদ্ধের যশোধরা, গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়া তেমনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদা। যুগ পাল্টেছে বারে বারে আর ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন নামে এই যুগলই এসেছেন বারে বারে।

একবার এক ভক্ত সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা, সব অবতারেই কি আপনি এসেছেন?" সারদাদেবী সহজ ভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, রামের সীতা, কৃষ্ণের রাধা, বুদ্ধের যশোধরা, গৌরাঙ্গের বিষ্ণুপ্রিয়া আর এই সেই আমি ঠাকুরের সারদা।"

ঠাকুর বারে বারে নিজের এবং সারদাদেবীর পরিচিতি ভাল ভাবেই দিয়ে গেছেন। তাঁর কথায়—"যিনি রাম তিনিই কৃষ্ণ"—কলি যুগে এই রামকৃষ্ণ। আর সারদাদেবী ছিলেন তো তাঁর শক্তির আকর। তাই ঠাকুরের অন্তর্ধানের পরও এই শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি বহুকাল ধরে ভক্ত হৃদয়ে লীলাখেলা ও জন কল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন।

আমাদের সংসারে বিবাহ একটি লৌকিক আচার, যার দ্বারা একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে করে দেওয়া হয় একটি সামাজিক বন্ধন। যার সূত্রপাত দৈহিক সম্বন্ধ দিয়ে কিন্তু শেষ হয় মানসিক যোগ বন্ধনের মধ্যে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-

সারদাদেবীর বিবাহটি ছিল এক অলিখিত পরিকল্পনার অঙ্গ। যেখানে দুটি প্রাণ আধ্যাত্মিকতার বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হল দৈহিক বন্ধন ছাড়াই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর বিবাহ প্রসঙ্গ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিন বছর বয়সের শিশু সারদা শিহড় গ্রামে গানের আসরে প্রতিবেশিনীর প্রশ্নের উত্তরে পতি নির্বাচন করেছিলেন অদূরে উপবিষ্ট অরুণকান্তি তরুণ গদাধরকেই।

কামারপুকুর গ্রামের ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এই গদাধর। তিনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির কালীবাড়ির পূজারী ছিলেন। তিনি ভবতারিণী মায়ের পূজা করতে বসে ভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। এই ভাবাবেশ ক্রমশ বাড়তে থাকে। মা ভবতারিণীকে সাক্ষাৎ দেখার আশায় প্রায় অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় মন্দিরের চতুর্দিকে ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরতে থাকেন। কখনও বা মাটিতে শুয়ে এমন ভাবে মুখ ঘসতে থাকেন যে সারামুখ রক্তারক্তি হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বর থেকে মাতা চন্দ্রমণির কাছে সংবাদ এলো যে, ভাবাবেগে আকুল হয়ে গদাধর কেবল 'মা-মা' বলছেন আর সমাধিস্থ হয়ে পড়ছেন। তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। এই সংবাদে চন্দ্রমণি কেঁদে আকুল, তিনি ছুটে গিয়ে পড়েন গৃহদেবতা রঘুবীরের চরণতলে। আত্মীয়-প্রতিবেশিনীরা চন্দ্রমণিকে বলেন যে ছেলের বিয়ে দিয়ে সুন্দরী বউ আনলেই গদাধরের এই উদাসভাব কেটে যাবে।

মাতা চন্দ্রমণি ও রামেশ্বর গদাধরের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মনের মতো পাত্রী পেলেন না। তখন একদিন উদাসী গদাধরই তাঁর মাকে বললেন, "জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে দেখগে, বিয়ের কনে সেখানে কুটোবাঁধা আছে।"[১]

এই ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর বিবাহ বন্ধন কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া নির্বন্ধ নয়, এটা বহু পূর্ব থেকেই প্রজাপতির সযত্নে রক্ষিত একটি পরিণাম।

আত্মভোলা, সৎ ও সরল গদাধরকে পাত্র হিসাবে পেয়ে রামচন্দ্র নিশ্চিন্তে এখানেই মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। লাল চেলী পরার দিন বুঝি এগিয়ে এলো তাঁর জীবনে। শৈশবে খেলাধূলার মধ্যেই চলেছিল তাঁর দিনগুলি। কিন্তু এবার তাঁকে যেতে হবে বাপের ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে। বিয়ের দিন ঠিক হল বৈশাখ মাসের শেষে। সারদার বয়স ছয় আর গদাধরের বয়স চব্বিশ।

এলো সেই বিয়ের দিন। বরসাজে এসেছেন গদাধর—তাঁর মুখমণ্ডলে চন্দনের ফোঁটা, গলায় বেলফুলের গোড়ে মালা, পরণে কোঁচানো ধুতি, মালকোচা করে বাঁধা, আর গায়ে রয়েছে নতুন কুর্তা। গ্রাম্য মহিলাদের সযত্নে সাজানো গদাধর হয়ে উঠেছেন কন্দর্পকান্তি মহাদেব। আর সঙ্গে এসেছেন বরযাত্রীরা—খালিপায়ে, হাঁটুর উপরে কাপড়, হাতে লাঠি, কাঁধের উপর গামছা ফেলে সেই খাঁদা-খোন্দ ভরা মেঠো গ্রাম্য পথ ধরে।

রামচন্দ্র নিয়মনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিবস্বরূপ সেই সদানন্দময় পুরুষের হাতে ষষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যাকে দান করলেন। কিন্তু এ দান তো যে সে দান নয়, এ হল গৌরীদান। সেই কোনকালে গিরিরাজ তাঁর বালিকা কন্যা গৌরীকে দান করে ছিলেন বয়ঃবৃদ্ধ শিবের হাতে আর আজ রামচন্দ্র এই বিবাহে সেদিনের সেই বিবাহের পুনঃ অনুষ্ঠান করলেন।

বিবাহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী আচারের সময় একটি অঘটন ঘটে। ভক্তপ্রবর অক্ষয় কুমার সেন তাঁর 'রামকৃষ্ণ পুঁথি'-তে বিবাহ রাতের অনুষ্ঠানের সেই ঘটনাটি লিখেছেন—

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে যবে বরে ঘেরে রমণী সকলে।।
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সুতা।।
হরিদ্রা মাখানো সুতা ছিল বাঁধা হাতে।
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে।।
চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন।।

আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে এই ঘটনাকে একটি অমঙ্গলের চিহ্ন হিসাবে ধরতে পারি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠাকুর এবং সারদাদেবীর বিবাহোত্তর জীবন সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে কাটেনি। সাধারণ দৈহিক বন্ধনের উর্দ্ধে এক অতি মানবীয় মানসিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে ঠাকুর-সারদাদেবী জগতের পাপী-তাপীদের উদ্ধার করার জন্য এক চিন্ময় ও চিন্ময়ীরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছেন।

চন্দ্রমণির ঘরে এলেন নববধূ সারদা। ঘর আলো করা বউ এসেছে সংসারে, বিবাগী ছেলে সংসারী হয়েছে, মাতা চন্দ্রমণি আজ খুশীতে ভরপুর। কিন্তু আজ রাতে নতুন বউকে আভরণ হীন করতে হবে। ঐ গয়নাগুলি লাহাবাবুদের, নতুন বউকে সাজানোর জন্য আনা হয়েছিল। লাল শাড়িপরা আর ঐ গয়নাগুলোতে তাঁর রূপ হয়েছে লক্ষ্মী প্রতিমার মতো। ঘুমন্ত সারদার মুখের দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন—কেমন করে সারদার গা থেকে তিনি গয়না খুলবেন! মায়ের মনের অবস্থা দেখে সে রাতে গদাধর নিজেই গয়না খোলার ভার নিয়েছিলেন।

ঘুমন্ত সারদা সকালে জেগে দেখেন যে তাঁর গায়ে একটিও গয়না নেই। গয়না না দেখতে পেয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। আর মাতা চন্দ্রমণিকে হাত-গলা দেখিয়ে বলেন যে, তাঁর এখানে এখানে যে গয়না ছিল তা কোথায় গেল? সইতে পারলেন না চন্দ্রমণি, তিনি বালিকাবধূ সারদাকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে গদাই তাঁকে আরো ভাল ভাল গয়না গড়িয়ে দেবে।

পরবর্তীকালের ঘটনাবলীতে চন্দ্রমণির সেদিনের আশাগুলি সম্পূর্ণ রূপেই

পূরণ হয়েছিল। ঠাকুর সারদাদেবীকে পরে অনেক গয়না গড়িয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চবটী-তলায় সীতাদেবীকে যখন দেখেছিলেন তিনি, তাঁর হাতে ডায়মণ্ড-কাটা বালা দেখেছিলেন, সারদাদেবীকে ঠিক তেমনি বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর জানতেন, ত্রেতার সীতাই কলির সারদা।

বিয়ের কয়েকদিন পরেই বেজে উঠল বিচ্ছেদের সুর। জয়রামবাটী থেকে কাকা এসে নববধূ সারদাকে দেখেন—হাতে বালা নেই, গলায় নেই মুক্তোর মালা, কানে নেই কানবালা, আর নাকে নেই নোলক। নতুন বউকে একেবারে বৈরাগী সাজিয়ে দেওয়ায় তিনি রুষ্ট হয়ে সারদাকে কোলে নিয়ে সোজা ফিরে গেলেন জয়রামবাটী।

এক বছর পূর্ণ হল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে একবার গদাধরকে শ্বশুর বাড়ি যেতে হয়। 'জোড়ে' ফিরতে হয় নতুন বউ নিয়ে। নতুন জামাই গদাধর এসেছেন শ্বশুরবাড়ি। শীতলপাটি পাতা তক্তাপোষে বসেছেন তিনি। সাত বছরের বালিকাবধূ সারদার কানে খবর পৌঁছতে নিজ হতেই ঘটি ভরে জল নিয়ে এলেন, নিয়ে এলেন তালপাতার একখানি পাখা। বয়সে বালিকা হলে কি হবে, অভিজ্ঞা স্ত্রীর মতো সযত্নে ধুয়ে দিলেন স্বামীর পদযুগল। শ্রান্তি বিনোদনের জন্য শুরু করলেন পাখার বাতাস। স্বামী নির্বেদানন্দ লিখেছেন, "প্রাপ্ত বয়সে তাঁহার দেবতুল্য স্বামীর যে সেবায় সারদা তন্ময় হইয়া নিজেকে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, বোধ হয় কোন দৈবী প্রেরণায় তিনি এদিন সে সেবাব্রতের উদ্বোধন করেন।"[২]

গদাধর সারদাদেবীকে নিয়ে কামারপুকুর ফিরলে মাতা চন্দ্রমণি চাইলেন পুত্র গদাধর কাছে থেকেই সংসার করুক। কিন্তু গদাধরের হাবভাব অন্য রকম। তিনি বিবাগী ছেলেকে সংসারমুখো করতে পারলেন না। গদাধর দক্ষিণেশ্বরে চলে যান এবং সারদাদেবীকে অবস্থান করতে হয় পিত্রালয় জয়রামবাটীতে।

দীর্ঘ সাত বছর পরে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুর এসেছেন। সারদাদেবী তখন পিত্রালয়ে ছিলেন, তাঁকে আনালেন মাতা চন্দ্রমণি। চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছেন। স্বামীকে দেখেছেন সাত বছর বয়সে। ভালো করে কিছু মনে পড়ে না, নিজ হাতে চরণ ধুয়ে দিয়েছিলেন—এইটুকুই মনে পড়ে তাঁর ঝাপসা-ঝাপসা।

স্বামীদেবতার চরণসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন তিনি এবং বুঝলেন এই তাঁর পরম আশ্রয়স্থল। যেখানে গেলে তিনি পাবেন দগ্ধ-দাবদাহের মধ্যে শ্যামল বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া, ধূসর-রুক্ষ পর্বত কন্দরের নির্মল নির্ঝরিণী, শুষ্ক বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা পান্থপাদক।

"ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে সারদাদেবীর প্রত্যক্ষ শিক্ষার এই শুরু। যেমন গুরু, তেমন শিষ্যা। রামকৃষ্ণ যেমন সারদাকে আদর্শ জীবনসঙ্গিনী করে গড়ে তুলতে আগ্রহী, সারদাদেবীও তেমনিই দেবকল্প রামকৃষ্ণের যোগ্যা লীলাসঙ্গিনী হতে উন্মুখ।"[৩]

এই সময় ঠাকুর সারদাদেবীকে কত ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে সারদাদেবী স্ত্রীভক্তদের কাছে বলেছেন, "প্রদীপের সলতেটি কিভাবে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক, কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে ইত্যাদি সংসারের খুঁটিনাটি কাজ থেকে, ভজন কীর্তন ধ্যান সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত। সকল বিষয়ই তিনি আমাকে শেখাতেন।"[৪]

স্বামীর সঙ্গে যে কমাস বাস করেছেন সারদা দেবী, তার সুখ স্মৃতি, অন্তরে তাঁর পূর্ণ হয়ে আছে। দেবতুল্য স্বামী তাঁর। সেই সুগৌর তনু, সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখ, প্রেমভরা চাউনি, কখনো কি বিস্মৃত হওয়া যায়? স্নেহ ভালবাসা ও মমতা দিয়ে সারদাদেবীকে তিনি অভিভূতই করেননি, তাঁর সম্মুখে তুলে ধরেছেন কল্যাণময় আদর্শ। স্বামীর সেই ভাবমূর্তিটি প্রোজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁর অন্তর পটে। এবারে সারদা দেবী এক নতুন আলোর স্পর্শানুভূতি নিয়ে ফিরলেন পিত্রালয়ে।

উত্তরকালে নিজের তখনকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে স্ত্রীভক্তদের কাছে সারদাদেবী বলেছিলেন, "হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে, এই সময় থেকে সর্বদা এমন মনে হত। সেই ধীর, স্থির, দিব্য উল্লাসে অন্তর কতখানি যে পূর্ণ হয়ে থাকত তা বলে বোঝাবার নয়।"[৫]

এখন তিনি শুধু দিন গুণছেন, কবে আসবে প্রেমময় স্বামীর আহ্বান। দেখতে দেখতে প্রায় চার বছর পেরিয়ে গেল। চার বছর আগেকার কিশোরী, আজ আঠারো বছরের এক পূর্ণ যুবতী। স্বামীকে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন তখন তাঁর কানে এলো ঠাকুর নাকি উন্মাদ হয়েছেন, উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। পাড়া-গাঁয়ের পরিবেশে গাঁয়ের বৌ-ঝিয়েরা কখনও বা রসিকতা করে কখনও বা সারদাদেবীর প্রতি সহানুভূতি জানায়। কিন্তু এই রসিকতা বা সহানুভূতি দুটিই ছিল সারদাদেবীর পক্ষে দুর্বিষহ।

দ্বিধা আর শঙ্কা সারদাদেবীর মনকে করে তোলে উদ্বেল। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজেই যাবেন দক্ষিণেশ্বরে, স্বচক্ষে দেখবেন তাঁর স্বামীর বাস্তব অবস্থা।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় গ্রামের অনেকেই গঙ্গাস্নানে চলেছেন কলকাতাভিমুখে। সারদাদেবীও পিতার সঙ্গে চলেছেন। জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বর এই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে চলতে হবে। স্বামীকে দেখবার জন্য এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। পথে প্রবল জ্বরে আক্রান্তও হলেন। সেদিনের যাত্রা স্থগিত রইল। নিকটে একটি চটিতে আশ্রয় নিলেন বাপ-বেটিতে। জ্বরের ঘোরে মা ভবতারিণীর দিব্য দর্শন লাভও হয়েছিল এবং মা ভবতারিণী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে স্বামী সন্দর্শন লাভ করবেন।

পরের দিন অসুস্থ শরীর আর অনিশ্চিত হৃদয়ে সারদাদেবী উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে স্বামীর কাছে। সারদাদেবীকে অসুস্থ দেখে ঠাকুর খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। ঘোমটার আড়াল থেকে সারদাদেবী দেখলেন যে তাঁর মানুষটি আগের

মতনই আছেন, আর ঠাকুরের অভ্যর্থনা দেখে বুঝলেন ঠাকুরও যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

ঠাকুর সারদাদেবীকে পরম সমাদরে তাঁর ঘরে স্থান দিলেন। তিনি নিজ হাতে সেবা যত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে নহবতে মাতা চন্দ্রমণির কাছে থাকার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সারদাদেবীকে নহবতে পাঠাবার পরই ঠাকুরের মনে পড়ল তোতাপুরীর কথা। তোতাপুরী ঠাকুরের কামজয়কে সন্দেহ করেছিলেন। কারণ তোতাপুরীর বিশ্বাস ছিল স্ত্রীকে দেশে রেখে কামজয়ের বড়াই সাজে না।

তখনই ঠাকুর আবার সারদাদেবীকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। মোহময়ী রাত্রির অন্ধকারে পূর্ণ নির্জনতায় ঘরের মধ্যে এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। সম্পর্ক তাঁদের স্বামী-স্ত্রী। দুরন্ত যৌবনের লালিত্য আকর্ষণ নিয়ে রক্তমাংসের সারদাদেবী জৈবিক প্রয়োজনের কুহক বিস্তার করেছেন সারা ঘরে। ঘরের বদ্ধ বাতাসে 'ম-ম' করছে সেই চিরন্তন আহ্বান, যা অনাদি কাল থেকে আকর্ষণ করে আসছে পুরুষকে। কিন্তু কামদেবের শরসন্ধান হল ব্যর্থ। জয়ী হলেন কামজয়ী রামকৃষ্ণ। নিদ্রিতা স্ত্রীকে দেখে তুচ্ছ স্ত্রী অঙ্গের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভগবৎপ্রেমে অবগাহন করাই শ্রেয় মনে করে তিনি ভাব সাগরে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

এই ভাবে দীর্ঘ আটমাসের রাত্রিগুলি কেটেছে একে একে শুধু তোতাপুরীর সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করতেই নয়, সমস্ত জগৎবাসীর কাছেও তিনি সাক্ষর রেখে গেলেন যে ভোগ করার সুযোগ পেয়েও ত্যাগ করার ক্ষমতাতে তিনি ভরপুর। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে সারদাদেবীর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে তখন আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা, কে বলতে পারে?"[৬]

এই সময় প্রতি রাতে ঠাকুরের গভীর সমাধিস্থ রূপ প্রত্যক্ষ করে সারদাদেবী মাঝে মাঝে ভয় পেতেন। পরে স্ত্রীভক্তদের কাছে ঠাকুরের ভাব সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সারদাদেবী ঠাকুরের ভাব সম্বন্ধে প্রায়ই বলতেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্য ভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবার নয়। কখন ভাবের ঘোরে মা ভবতারিণীর সঙ্গে কত কি কথা, কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত। সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্ব শরীর কাঁপত, আর ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে। ভাব সমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না। একদিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়। তারপরে ঐ রূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখলে এই নাম শোনাবে, এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে। তখন আর অত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত।"[৭]

এই সময়ে একত্রে থাকাকালীন সারদাদেবী স্বামীর এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। একদিন ঠাকুর সারদাদেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?" সারদাদেবী বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে উত্তর দিয়েছিলেন, "না, আমি তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।"[৮]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে সারদাদেবীর সঙ্গে ঠাকুরের সম্পর্কটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সারদাদেবী ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন তাঁকে সাধনভ্রষ্ট করতে নয় বরং সাধনসঙ্গিনী হিসাবে তাঁর সাধনায় আবও সাহায্য করতে, এবং তিনি তাই-ই করেছিলেন। ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পরে সারদাদেবী হয়েছিলেন সঙ্ঘকর্ত্রী এবং সারা জীবন তিনি ঠাকুরের আরব্ধ কর্মই পরিচালনা করে গেছেন।

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রাপ্তি সম্পর্কে সারদাদেবীকে বোঝাতেন যে সারদাদেবীও ঈশ্বরকে ডাকলে তাঁরও ঈশ্বর দর্শন হতে পারে।

সারদাদেবীর সঙ্গে মনের বোঝাপড়ায় ঠাকুর যখন বুঝলেন যে এখানে কোন ভাবের ঘরে চুরি নেই, মন এক চায় কিন্তু মুখ আর এক বলে, এটা যখন সত্যি নয় তখন তিনি সারদাদেবীকে জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যার রাত্রিতে নিজের ঘরে লোকচক্ষুর অন্তরালে ষোড়শী পূজা করবেন তার আয়োজন করেছেন।

যা ঘটেনি কোনদিন, কোনকালে, কোন ভক্ত বা সাধকের জীবনে, ঠাকুর সেই অসাধ্য সাধনে দৃঢ়তর। সারদাদেবী স্ত্রীভক্তদের কাছে ষোড়শী পূজার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, সেই রাতে ঠাকুর প্রথমে তাঁকে আলপনা দেওয়া আসনে বসিয়েছিলেন, নিজ হাতে আলতা, কপালে মাথায় সিঁদুর এবং নব বস্ত্রটি পরিয়ে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে তাঁর পাদমূলে অর্ঘ্য হিসাবে সাধনার সমস্ত ফল, জপের মালাটি পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন প্রণাম মন্ত্রটি—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

ষোড়শীপূজার ঘটনাটি ঠাকুর তথা সারদাদেবীর সাধনপথের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাগতিক সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। তাই স্ত্রী হিসাবে সারদাদেবীর স্বামীর কাছ থেকে পূজাগ্রহণ একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। কোন স্ত্রীই মানসিক দিক থেকে স্বামী দ্বারা পূজিত হওয়া বা স্বামীর পূজা গ্রহণ করার কথা কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু সাধ্বী সারদাদেবী ঠাকুরের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি সর্বান্তকরণে চাইতেন স্বামীর সাধনসঙ্গিনী হয়ে স্ত্রীর প্রকৃত কর্তব্য পালন করতে। তাঁর কাছে এই ষোড়শীপূজা ছিল ঠাকুরের সাধনের একটি অঙ্গআর সেই জন্যই তিনি ষোড়শী পূজায় অংশগ্রহণ করে ঠাকুরের সাধনসঙ্গিনী হয়ে একটি জ্বলন্ত বাস্তব দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন।

সারদাদেবীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার খুবই মিষ্টি ছিল। তিনি কখনই ভুলেও এমন কাজ করতেন না যাতে সারদাদেবী কোনরকম আঘাত পান। এমন কি ঠাকুরের কোন ব্যবহারে সারদাদেবী হয়তো মনে কিছু আঘাত পেয়েছেন এই কল্পনাতেই ঠাকুর শশব্যস্ত হয়ে থাকতেন।

এই দক্ষিণেশ্বরে একদিন সারদাদেবী ঠাকুরের ঘরে খাবার নিয়ে এসেছেন। ভাবরাজ্যের অধীশ্বর ঠাকুর কি ভাবছিলেন তাই খেয়াল করেন নি। খাবারগুলি যথাস্থানে পরিপাটি করে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় ঠাকুর বললেন, "দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।" সারদাদেবী তা শুনে বললেন, "আচ্ছা"। কণ্ঠস্বর কানে আসতেই ঠাকুর উঠলেন চম্‌কে। ঠাকুর ভেবেছিলেন তাঁর ভাইঝি লক্ষ্মী খাবার এনেছে। তাই তিনি "দিয়ে যাস" বলেছিলেন। তখনই সারদাদেবীকে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন যে লক্ষ্মী ভেবেই 'দিয়ে যাস্' বলেছেন। এই ব্যাপারে তিনি দুঃখ করতে বারণ করলেন এবং পরদিনও নহবতে সারদাদেবীর কাছে গিয়ে অনুশোচনা করেছিলেন।

ঠাকুরের কাছ থেকে এত সম্মান পেয়েও সারদাদেবী কোন দিন অহঙ্কারী হয়ে ওঠেননি বা অন্যান্য ভক্তদের তুলনায় ঠাকুরের কাছে একটি বিশেষ স্থান থাকতে পারে এবিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন। সম্পূর্ণ আত্মোবিলোপণের দ্বারা ঠাকুরের সুবিধা-অসুবিধা দেখা এবং ঠাকুরের সাধনপথের পরিবেশটি পরিচ্ছন্ন রাখাই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যান ধারণা।

সারদাদেবী বলতেন যে ঠাকুরের ইহলীলা সংবরণের পর তাঁর আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অবান্তর মাত্র। কিন্তু ঠাকুরই তখন তাঁকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যে সারদাদেবীকে ঠাকুরের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করতে হবে। জীবনকালে ঠাকুরের যে দায় ছিল সে দায় এখন সারদাদেবীতে বর্তেছে। ঠাকুর তাঁকে বলতেন যে তিনি মেয়েমানুষ হলেও তাঁর করণীয় অনেক কিছুই আছে। কলকাতার মানুষগুলোকে ঠাকুর মনে করতেন যে অন্ধকারে কিছু পোকা কিলবিল করছে তাই এদের ভাল করার জন্য সারদাদেবীকে বেঁচে থাকতে হবে আর ঠাকুরের আরব্ধ কাজকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ঠাকুর প্রথম থেকেই জানতেন যে সারদাদেবী হবেন জগন্মাতা। পৃথিবীর সমস্ত মানুষই তাঁর সন্তান সদৃশ। তাই তারই প্রস্তুতি করেছিলেন সারদাদেবীর সেই ইচ্ছার উত্তরে। একদিন সারদাদেবী ঠাকুরের কাছে একটি সন্তানের জননী হওয়ার বাসনা জানালে ঠাকুর তাঁকে বহু সন্তানের জননী হওয়ার আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, "তোমায় এমন সব রত্ন ছেলে দিয়ে যাব মাথা কেটে তপিস্যে করেও মানুষ পায় না। তবে দেখবে, এত ছেলে তোমায় মা বলে ডাকবে, তোমার সামলানো ভার হয়ে উঠবে।"[৯]

এই ধরনের কথা ঠাকুর অতীতে একটি ঘটনায় শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরী

দেবীকেও বলেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন উত্তরকালে তাই ঠিকই হয়েছিলেন সারদাদেবী। তাই দেখা যায় ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সারদাদেবী প্রকৃত সহধর্মিণীর মতোই ঠাকুরের আরব্ধ কাজকে সুসম্পন্ন করার জন্য এই মাটির পৃথিবীর আপামর মানুষকে সন্তানজ্ঞানে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলেন।

যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পার্ষদেরা ধীরে ধীরে তাঁর পদপ্রান্তে সমাগত হচ্ছেন, সেই সময়কার ঘটনা। সারদাদেবী তখন দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকেন। ঠাকুর ছিলেন তাঁর ঘরে, যেটি এখন তাঁর ঘর বলে পরিচিত। সারদাদেবী নিজ হাতে নিত্য অন্ন-ব্যঞ্জন রন্ধন করেন এবং নিজেই ঠাকুরের ঘরে এসে অন্ন নিবেদন করেন। একদিন তিনি ঠাকুরের জন্য অন্ন নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক স্ত্রীভক্ত তাঁর হাত থেকে চেয়ে ঠাকুরের অন্নের থালাটি বয়ে নিয়ে ঠাকুরের কাছে রেখে চলে গেল। ঠাকুর তখন সারদাদেবীকে বললেন যে যার তার স্পর্শ করা অন্ন খেতে তাঁর কষ্ট হয়। তিনি যেন নিজ হাতেই অন্ন নিবেদন করেন। ঠাকুরের কথা শুনে সারদাদেবী হাত জোড় করে বললেন, তা তো আমি পারব না ঠাকুর! তোমার খাবার আমি নিজে নিয়ে আসব; কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।"[১০]

সারদাদেবীর উত্তর ঠাকুরকে কিন্তু রাগান্বিত করে নি। বরং ঠাকুর এতে সন্তুষ্টই হয়েছিলেন। কারণ ঠাকুর সারদাদেবীকে জগৎ সংসারে মা রূপেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ঐ মেয়েটির মা ডাকে সাড়া দিয়ে সারদাদেবী তাঁর অন্তরের সার্বজনীন মাতৃত্বের ভাবই প্রকাশ করেছিলেন এবং ঠাকুর এইটি-ই চেয়েছিলেন।

সারদাদেবী বলেছেন যে ঠাকুর সব সাধনার মধ্যেই লীলা আস্বাদন করতেন, তবে এই যুগে তাঁর ত্যাগই হল বিশেষত্ব। এ রূপ অস্বাভাবিক ত্যাগ সত্যই বিরল। এই ত্যাগ কি রকম ছিল, তার একটি ছোট ঘটনাও তিনি বলেছেন,—একদিন ঠাকুর কয়েকটি টাকা আর কিছু মাটি হাতে নিয়ে—"টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলতে বলতে দুইই তিনি গঙ্গায় বিসর্জন দেন। এ ঘটনা প্রায় সকলেরই জানা। আসল কথা ভগবান লাভের প্রতিকূল সব কিছুই তিনি দেহে মনে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। আর সারদাদেবীও ঠাকুরের মতো ত্যাগের জগতে কিংবদন্তী হয়ে আছেন।

দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে এক মাড়োয়ারী ভক্ত ঠাকুরকে দশহাজার টাকা দিতে চাইলে তিনি সে টাকা গ্রহণে অক্ষমতা জানান। কিন্তু ঠাকুর সারদাদেবীকে পরীক্ষা করবার সুযোগটি ছাড়লেন না। তিনি সারদাদেবীকে টাকা নিতে বললেন, কিন্তু এই টাকা সারদাদেবীকেও প্রলোভিত করতে পারেনি। তিনি সানন্দে এটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যেহেতু ঠাকুরও এটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

সারদাদেবী ঠাকুরের সহধর্মিণী—বিবাহ সূত্রে তো বটেই, এঁদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা চিরন্তনের—জন্মজন্মান্তরের। অগ্নি এবং দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন তাঁরাও তাই। একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক।

একবার স্বামী কেশবানন্দ সারদাদেবীর কাছে ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে আক্ষেপ করেন যে দুর্ভাগ্যবশত তিনি ঠাকুরের দর্শন পেলেন না। তাতে সারদাদেবী নিজেকে দেখিয়ে বলেন যে তিনি তাঁরই অন্তরে সূক্ষ্ম দেহে আছেন। ঠাকুরও নিজ মুখে বলেছেন, "আমি তোমার ভেতর সূক্ষ্মদেহে থাকব।"[১১]

ব্রহ্মচারী অক্ষয়কুমার সেন তাঁর "রামকৃষ্ণ পুঁথি"-তে ঠাকুর এবং সারদাদেবী যে এক আত্মা ছিলেন তা অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করেছেন,—

শ্রী প্রভু লীলার স্বামী, সঙ্গে মাতাঠাকুরাণী,
সনাতনী সৃষ্টির আধার।
বিভিন্ন মাত্র ভৌতিকে, এক আত্মা আধ্যাত্মিকে,
অভ্যন্তরে দোঁহে একাকার।

ঠাকুর চলে গেলেন রইলেন তাঁর অগণিত ভক্তগণ। ঠাকুরের উপস্থিতির অভাবটা পূরণ করে নিয়েছিলেন তাঁরা, সারদাদেবীকে দিয়ে। তাই তাঁরা সারদাদেবীর মুখ নিঃসৃত সমস্ত বাণীগুলি পরম ভক্তি এবং নিবিষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছেন। তাই ভক্তগণ ঠাকুরকে পরম ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি সারদাদেবীকে ব্রহ্মময়ী·আদ্যাশক্তি রূপে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন তাঁর শ্রীচরণে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৩০
২। জননী সারদাদেবী, স্বামী নির্বেদানন্দ, শ্রীসারদামঠ, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ: ২১
৩। শতরূপে সারদা পৃ: ২৯৫
৪। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, পৃ: ১৩৯
৫। তদেব, প্রথম ভাগ সাধক ভাব, পৃ: ৩৪৩
৬। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৫২
৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব পূর্বার্ধ, পৃ: ১৩৯
৮। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৫১
৯। শ্রীমা — আশুতোষ মিত্র, পৃ: ৮০
১০। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ ৯৫
১১। তদেব, পৃ: ৪৮৯

মা সারদা শরণে গিরিশ

বহুদিন ধরেই ঠাকুরের ভক্ত ও শিষ্যগণ সারদামণিকে মা রূপে গ্রহণ করেন নি। তারা সকলেই মনে করতেন ইনি "ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরিবার।" তাদের কাছে ঠাকুর ছিলেন একত্রে মা ও বাবা। নিরঞ্জনই সারদামণিকে মা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। একদা গিরিশচন্দ্রের কাছে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হলে তিনিও বলেছিলেন এটাই সত্য যে নিরঞ্জনই সারদামণিকে মাতৃ আসনে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

একদিন বিকালে গিরিশচন্দ্র সস্ত্রীক ছাদে ঘুরছিলেন। সেখান থেকে বলরামবাবুর ছাদ কিছু দূর হলেও দেখা যায়। মা তখন বলরামবাবুর বাড়ি ছিলেন। সেদিন মাও ঐ সময় ছাদে উঠেছিলেন। গিরিশ-পত্নীর মায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখ আমাদের মা ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন।" এই কথা শুনেই গিরিশচন্দ্র চমকে উঠলেন। গিরিশচন্দ্র নিজে তো তাঁর নিজের জীবনটা জানেন। তিনি মনে করলেন যে তাঁর পাপ চক্ষু দিয়ে মাকে লুকিয়ে দেখা তো আরো পাপ। তাই তিনি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন। গিরিশচন্দ্র সত্যই সত্যাশ্রয়ী এ ঘটনা সেটাই প্রমাণ করে।

সুলক্ষণা পত্নী ভাগ্যে গিরিশচন্দ্র ঠাকুর রামকৃষ্ণকে গুরুরূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু এই পত্নী দুইটি কন্যা ও একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে চিরবিদায় নেন, তার ফলে গিরিশচন্দ্র চতুর্দিকে শূন্যতা অনুভব করেন। যেহেতু ঠাকুর রামকৃষ্ণকে বকলমা দেবার পর সুখ দুঃখ সবই যে তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করেছেন, তাই আজ আর গিরিশচন্দ্রের শোক-তাপ দগ্ধ হৃদয়ে শোকের অধিকার রইল না।

এই পুত্র সন্তানটির প্রতি গিরিশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহ ছিল। কারণ তিনি একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের পদতলে বসে ঠাকুরকেই পুত্ররূপে পাবার প্রার্থনা করেছিলেন। ঠাকুর এতে সম্মত হন নি। কিন্তু ঠাকুরের লীলা সংবরণের দুই বছর পরে গিরিশচন্দ্রের ঘরে এই পুত্র সন্তানটি এলো। তখন গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস হল যে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য দয়ার ঠাকুর তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে না পেরে ভক্তের গৃহে চলে এসেছেন, পুত্ররূপে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে।

১৮৯০ সালের ঘটনা। মা কিছুদিনের জন্য অবস্থান করছেন সৌরেন্দ্র মোহন ঠাকুরের বাড়ির দোতলায়। এই সময় একদিন গিরিশচন্দ্র তাঁর তিন বছরের

শিশুপুত্রটিকে নিয়ে এলেন এই বাড়িতে। দামাল শিশুটি বাপের কোল থেকে নেমেই আঙুল দেখাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উপর দিকে ওঠার জন্য অর্থাৎ সে দোতলায় যেতে চাইছে। শিশু পুত্রটিকে এইরূপ করতে দেখে বাড়ির একজন সেবক তাকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে মার কাছে নামিয়ে দিল। কি আশ্চর্যের ব্যাপার শিশুটি সাগ্রহে মাকে প্রণাম করে দাঁড়াল। মা তখন সস্নেহে তাকে আদর করে টেনে নিয়ে কোলে বসালেন। শিশুটি মার আদর খেয়েই দৌড়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা—গিরিশচন্দ্র। শিশুটি বাবার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল উপরে নিয়ে যাবার জন্য। গিরিশচন্দ্র যতই বলেন, "আরে আমি পাপী তাপী, আমার কি মায়ের সামনে যাওয়া শোভা পায়?" পুত্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে টানাটানি করছে, আর আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে সিঁড়ির দিকটা দেখাচ্ছে। গিরিশচন্দ্র পড়েছেন মহামুস্কিলে, আর পড়বেনইতো। মা যে ডাক পাঠিয়েছেন শিশুর মধ্য দিয়ে গিরিশকে। পালাবার কোন উপায় নেই। তাই শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে গিরিশচন্দ্র এসে হাজির হলেন মায়ের পদতলে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, "মাগো, আমার এই অপবিত্র দেহটাকে নিয়ে তোমার পায়ের তলায় এসে পড়লুম।"

এই ঘটনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব উল্লেখ করে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন, "শ্রীযুক্ত মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত পূর্ব হইতেই তাঁহাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও ভক্তগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি গিরিশের আগমনের পর হইতেই প্রকাশ্যভাবে জগদম্বারূপে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে লজ্জাশীলা মা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহার দর্শন পাইতেন না, নীচে প্রণাম জানাইয়া বিদায় লইতেন। গিরিশাদির আগমনের পর হইতে শ্রীমাও ভক্তজননীরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকিলেন।"

গিরিশচন্দ্রের প্রিয় পুত্রটি স্বল্পায়ু ছিল। মাত্র তিন বছর বয়সেই অকালমৃত্যু হওয়াতে তিনি ভেঙে পড়েছিলেন। তখন মা জয়রামবাটীতে ছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে গিরিশচন্দ্র তাঁর গুরুভাই নিরঞ্জনের সঙ্গে এসে হাজির হলেন জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে। এটা ১৮৯১ সালের ঘটনা। এখানে অবস্থানকালে একদিন স্নানান্তে ভক্তিপূর্ণচিত্তে মাকে প্রণাম করে গিরিশচন্দ্র মায়ের মুখ দেখে চমকে ওঠেন। তিনি আরও ভালো করে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যান অতীতকালের ঘটনার এক স্মরণালোকে। এই মুখটি ঠিক সেই মুখ, যে মা বিসূচিকা রোগাক্রান্ত যুবক গিরিশচন্দ্রকে মহাপ্রসাদ দিয়ে রোগমুক্ত করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনে তো দ্বন্দ্ব সন্দেহের অবিরাম আনাগোনা। তাই প্রশ্ন পাঠালেন মায়ের কাছে আগের ঘটনাটি উল্লেখ করে। আর জানতে চাইলেন এই মা কি তাঁর সেই মা।

মা প্রশ্নটি শুনে বলে পাঠালেন যে তিনি তাঁর গুরুপত্নী নন, তিনিই সেই মা। এই উত্তর গিরিশচন্দ্রের মনের আকাশের দ্বিধা দ্বন্দ্বের কালো মেঘকে উড়িয়ে দিল। পরম বিশ্বাসে গিরিশচন্দ্র মায়ের উদ্দেশ্যে জানালেন শতকোটি প্রণাম।

এই জয়রামবাটীতে গিরিশচন্দ্র স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে বেশ কিছু দিন মায়ের কাছে ছিলেন। মায়ের অপার স্নেহ অকৃত্রিম ভালবাসায় শান্ত হয়েছে গিরিশচন্দ্রের অশান্ত হৃদয় আর মন হয়েছে প্রসন্ন।

এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের মনে প্রবলভাবে বৈরাগ্যভাব জাগে। যদিও পূর্বে তাঁর মনে এই বৈরাগ্যভাবের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল তখন ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে তাঁর মন থেকে বৈরাগ্যভাব কাটিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন গিরিশচন্দ্র মায়ের কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু এই সন্ন্যাস গ্রহণে মায়ের বিরুদ্ধ মনোভাব বুঝতে পেরে গিরিশচন্দ্র নানাভাবে বোঝাতে শুরু করলেন কেন তাঁর সন্ন্যাস প্রয়োজন। কিন্তু মা কোন মতেই তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণের সম্মতি দিলেন না। অবশেষে তিনি মেনে নিলেন মায়ের আদেশ।

এরপর কলকাতায় ফিরে গিরিশচন্দ্রকে এক অন্য মানুষরূপে দেখা গেল। ঠাকুরের অলৌকিক আলোকে উদ্ভাসিত গিরিশচন্দ্রের কলম থেকে ঠাকুরের লোকশিক্ষার ধারাটি বজায় রেখে এক অনুপম রচনাশৈলী নির্গত হল।

এই বছরই মা তখন কলকাতার সরকার বাড়ী লেনে হলুদের গুদাম বাড়িতে বাস করছিলেন সেই সময় গিরিশচন্দ্র মায়ের কাছে প্রায়ই যেতেন প্রণাম করতে। একদিন মা কলকাতা থেকে দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় গিরিশচন্দ্র যোগানন্দ স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে মার কাছে এসে হাজির। মার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গিরিশচন্দ্র বললেন যে, এখানে এলে তাঁর মনে হয় তিনি যেন এক ছোট শিশুরূপে নিজের মায়ের কাছেই এসেছেন। গিরিশচন্দ্র ঐদিন সেখানে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে মার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন, "তোমরা কি ভাবতে পারো যে তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পারো যে, মহামায়া সাধারণ স্ত্রীলোকের মতন ঘরকন্না ও আর সব রকম কাজকর্মই করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূতা হয়েছেন।"

এই প্রসঙ্গ নিয়ে শ্রদ্ধেয় কালীমামার সঙ্গে একবার গিরিশচন্দ্রের বচসা হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র মাকে জগজ্জননী, মহামায়ারূপে দেখেছিলেন কিন্তু কালীমামা মায়ের দেবীত্ব স্বীকার করেননি। তিনি বললেন, "কই আমরা তো এক মাতৃগর্ভে জন্মেছি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।" তখন গিরিশচন্দ্র তাঁকে বলেন "অঘটন-ঘটন পটিয়সী মহামায়া তোমাকে দিদিরূপে সমস্ত জীবন ভুলিয়ে রাখতে পারেন না? যাও যদি ইহ এবং পরজন্মে মুক্তি চাও তো এখনই মায়ের পাদপদ্মে শরণ লও।"

আর একটি ঘটনায় গিরিশচন্দ্রের মায়ের প্রতি আকর্ষণ কত গভীর ছিল তা জানা যায়। একবার মা দীর্ঘকাল পরে জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় ফিরছেন। মাকে দর্শনের জন্য মহারাজ এবং বাবুরাম স্টেশনে এসে দেখলেন গাড়ী তিন ঘন্টা লেট। মাকে প্রণাম না জানিয়ে ফিরতে তাঁদের মন চাইছে না। তাই অধীর আগ্রহে তিন ঘন্টা অপেক্ষার পর ট্রেন এলো স্টেশনে, মা নামছেন। গোলাপমা দেখতে পেলেন মহারাজকে। দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "মহারাজ আপনাদের কি একটু আক্কেল নেই, আপনারা কেমন মানুষ! মা এক দেশ থেকে তেতে পুড়ে আসছেন, আর আপনাদের প্রণামের জন্য হুড়োহুড়ি।" মহারাজ নীরবে চলে এলেন।

বাগবাজারে মায়ের পৌঁছবার পরই গিরিশচন্দ্র এসে হাজির। তিনি খুব শান্ত স্বরেই মাতৃদর্শনের অভিলাষ জানালেন। কিন্তু গোলাপ মায়ের খবরদারির হাত থেকে গিরিশচন্দ্রও রেহাই পেলেন না। তাই গিরিশচন্দ্র গোলাপমাকে বললেন, আচ্ছা ঝাঁঝাল মেয়েমানুষ, মার সঙ্গে ছেলে দেখা করবে তার আবার সময়-অসময় কি আছে।" এই কথা শুনে গোলাপমাতো ক্ষেপেই লাল, তিনি মায়ের কাছে অভিযোগ করলেন যে গিরিশচন্দ্র তাকে ঝাঁঝাল মেয়েমানুষ বলেছেন। মা তখন গোলাপকে বকলেন। গিরিশচন্দ্র এসে প্রসন্ন মনে মাকে প্রণাম করে চলে এলেন।

১৯০৭ সাল। গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে দুর্গাপূজা। তিনি মাকে আনতে চান। তখন মা খুবই অসুস্থ। তাই তিনি এই উৎসবে আসতে পারবেন না শুনে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন, মা না এলে পূজা করা নিরর্থক। তিনি পূজা করবেন না। মায়ের কানে এই কথা আসতেই মা সম্মত হলেন। মায়ের উপস্থিতিতেই কল্পারম্ভ হল। এলেন মহাসপ্তমী দিনে। মহাঅষ্টমী দিনেও মা গিরিশভবনে এলেন। সেবার গভীর রাতে ছিল সন্ধিপূজার সময়। শারীরিক দুর্বলতার জন্য মা সন্ধিপূজোয় উপস্থিত থাকবেন না। গিরিশচন্দ্র এই সংবাদ পেয়ে ভেবে ঠিক করলেন,—তবে আর পূজামণ্ডপে থেকে কি হবে। মা-ই যখন আসবেন না তবে সন্ধিপূজা কাকে নিয়ে হবে।

হঠাৎ সন্ধিপূজা আরম্ভের কিছু পূর্বে মা স্ত্রী ভক্তগণের সঙ্গে পায়ে হেঁটে একেবারে গিরিশচন্দ্রের খিড়কির দরজার কাছে এসে হাজির। দরজায় ধাক্কা দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে ডাকলেন। মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনামাত্র গিরিশচন্দ্র ছুটে এলেন। আপন সৌভাগ্যে ভাগ্যবান গিরিশচন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে মার উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি ভেবেছিলুম, মা ছাড়া আমার পূজা অসমাপ্ত। কিন্তু তুমি যে করুণাময়ী। অসীম তোমার করুণা। তাই মাগো, তুমি কি না এসে থাকতে পার?" পূজা প্রাঙ্গণে সমবেত ভক্তগণ মার শ্রীচরণে একে একে অঞ্জলি দিলেন। মায়ের উপস্থিতিতেই গিরিশভবনে আনন্দের সঙ্গে সন্ধিপূজা সম্পন্ন হল। মহানবমী পূজা এঁকই ভাবে কেটে গেল। এই রাতে সর্বশ্রেণীর নারী-পুরুষ মার শ্রীচরণে অঞ্জলি দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন সে বছর। এই ভাবে গিরিশ আয়োজিত মাতৃপূজা সার্থক ও সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছিল।

এখানে আমাদের স্মরণ করা যেতে পারে যে গিরিশচন্দ্রই প্রথম পুরুষভক্ত যিনি মাতৃপূজা করে মাতৃমহিমা প্রচার করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্র অভিনীত নাটকে আমন্ত্রিত হয়ে মা 'দক্ষযজ্ঞ', বিল্বমঙ্গল', 'জনা' ইত্যাদি নাটক দেখতে দেখতে অনেক সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। এর প্রমাণ আছে ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্যের বিবরণীতে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীতে মায়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্বে মায়ের দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এসে মা রামকৃষ্ণানন্দজীকে দর্শন দেন। আনন্দাপ্লুত রামকৃষ্ণানন্দজী গিরিশচন্দ্রের কাছে মায়ের এই উপস্থিতি বর্ণনা করেন এবং এই ঘটনাটিকে গিরিশচন্দ্র একটি গানের বাণীতে লিপিবদ্ধ করেন। গিরিশচন্দ্রের সেই বিখ্যাত গানটি—

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে "আমি আমি" ঘোর কুস্বপন, নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী।।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয়, মার নামে পূর্ণ অবনী।।
কহিছে জননী "কেঁদো না, রামকৃষ্ণ পদ দেখ না।
নাহিক ভাবনা রবেনা যাতনা।।
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন তারণ গুণমণি।।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। গিরিশচন্দ্রের পারলৌকিক কাজের দিন তাঁর আত্মীয় পরিজনেরা মাকে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেন। তখন মা শোকাহত চিত্তে বলেছিলেন, "গিরিশ বিহীন গিরিশের বাড়িতে যাই কেমন করে?"

নারী শিক্ষা ও মা সারদা

বেদ পুরাণের যুগ থেকে আমরা দেখতে পাই ইতিহাসের পাতায় মাঝে মাঝে অনেক মহিয়সী নারীর মুখ নিজস্ব জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। কখনো কখনো তাঁরা জ্ঞান বা বিদ্যার মূর্ত প্রতীক, আবার কখনো বা ধর্মে, সমাজ সংস্কারে বা সংস্কৃতিতে এবং সমাজদর্শনে কৃতিমান্যা। ঠাকুরের সহধর্মিণী সারদামণি এমনই এক স্নেহময়ী সারগর্ভা দেবী। সারদামণি নামের আগে 'সহধর্মিণী' কথাটি সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহার হয়নি। ঠাকুরের ধর্মই ছিল সারদামণির ধর্ম, সেই অর্থে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্মিণী।

যিনি সার দান করেন তিনিই সারদা। গাছে যেমন সার দিলে গাছ হয়ে ওঠে উজ্জীবিত, পায় সে নতুন জীবনের সন্ধান, তেমনি মা সারদা আমাদের জীবন-তন্ত্রীতে যে সার দিয়েছেন অর্থাৎ যে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন তাতে আমরা আমাদের জীবনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে শিখেছি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, চেয়েওছিলেন যে মা সারদামণি সকলকে জ্ঞান দেবেন। সেই জন্যই তো তাঁর আসা। ধীরে ধীরে ঠাকুরের কথাই সত্য হল। আমাদের ভাব জগতের চিন্ময়ী মা ধরাধামে সারদা হয়ে বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর প্রথম সন্তান ছিলেন মা সারদা। শৈশবে কঠোর দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়ে গ্রাম্য সংসারের যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে ছোট ছোট ভাইবোনেদের পরম স্নেহে লালন করতেন।

১২৬৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে মাত্র ছয় বছরের বালিকা সারদার সঙ্গে চব্বিশ বছরের যুবক গদাধরের শুভ বিবাহ হয়। প্রকৃতপক্ষে মা সারদার পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। এর কারণই ছিল বাংলাদেশের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা। মেয়েরা, বিশেষতঃ গ্রামের মেয়েরা, পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়া শিখবে এটা ছিল কল্পনাতীত। তাই মা সারদার পাঠশালায় যাওয়া হয় নি। কিন্তু মা, বাবা ও ছোট ছোট ভাইবোনেদের সংসারে থেকে স্বাভাবিক স্নেহভালবাসা ও মানবিকতাবোধর সহজাত শিক্ষা মা সারদার প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনকে করে তুলেছিল মানবিকতাপূর্ণ। আর মানবধর্মই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এই শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছিল ঠাকুরের সংস্পর্শে এসে।

শ্রীমা সারদামণি ভক্তমণ্ডলীর কাছে বলেছিলেন যে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন ঠাকুর স্বয়ং। প্রদীপের সলতেটি কিভাবে রাখতে হবে, বাড়ির প্রত্যেকে—কে কেমন লোক ও কার সঙ্গে কি রূপ ব্যবহার করতে হবে প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কাজ থেকে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত ঠাকুর তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন মা সারদামণি ছিলেন গ্রাম্য মেয়ে এবং গ্রাম্য সংস্কৃতির মধ্যে তাঁর ঘোরা ফেরা। মনের গঠন চালচলন সবই ঘরোয়া এবং গ্রাম্য। কিন্তু শ্রীমা সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে এলে ঠাকুর তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কি গো, তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?"[১] শ্রীমার তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল, "না, আমি তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্ট পথেই সাহায্য করতে এসেছি।"[২] শ্রীমা সারদামণি যদি একটি সাধারণ সংসারমুখী নারী হতেন তাহলে এই উত্তর তাঁর মুখে আসত না। তাঁর মধ্যে ছিল সুন্দর আধার যা ঠাকুরের সংস্পর্শে বিকশিত হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে। মার জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করলে আমরা মানবীর পরিবর্তে দৈবীগুণ-বিভূষিতা এক নারীকে দেখতে পাই। কারণ তিনি যেমন একদিকে ছিলেন স্নেহময়ী মাতা, কর্তব্যপরায়ণা গৃহিণী তেমনি অপর দিকে কোমলহৃদয়া ও দয়াবতী ঈশ্বর বিশ্বাসী সন্ন্যাসিনী। নারী জাতির কাছে তিনি ছিলেন আদর্শ প্রতীক—সেই নারী সংসারের গৃহকোণেই থাকুন বা সংসার বিমুখ ঈশ্বর নিবেদিতপ্রাণাই হউন।

শ্বশুরবাড়ি এসেও মায়ের বিরাম ছিল না। শাশুড়ী এবং স্বামীর সেবা ছাড়া গৃহস্থালির সব কাজ তাঁকে নিজ হাতেই করতে হত। তবুও সংসারের সেবায় কখনও তাঁর ক্লান্তি আসেনি, প্রতিদানের একটুও অপেক্ষা না করে সবার প্রতি সব কর্তব্য করে গেছেন নিখুঁত ভাবে। শ্রীমা মেয়েভক্তদের বলতেন "কাজই লক্ষ্মী"[৩], "কাজে দেহ-মন ভাল থাকে"[৪], "একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়"।[৫]

এক অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী গোপেশ দেখলেন যে, অনেক ঝি-চাকর, সেবক সেবিকা থাকা সত্ত্বেও শ্রীমা বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে আটা মাখছেন। সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে শ্রীমার এই কায়িক পরিশ্রমটি ব্রহ্মচারীর কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল এবং তিনি মাকে তাঁর মনের এই কথা জানাতে মা উত্তর দিলেন, বাবা, কাজ করাই ভাল।" তারপর একটু নীরব থেকে আবার বললেন, "আশীর্বাদ কর, যতদিন আছি, যেন কাজ করেই যেতে পারি।"[৬] এই সমস্ত থেকে বোঝা যায় যে, মা নারী সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে সাংসারিক কোন কাজকর্ম তুচ্ছ বা অবহেলার বস্তু নয়। এই শিক্ষা শ্রীমা ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়েছেন।

মা বিশ্বাস করতেন নিজের জীবনই হওয়া উচিত অপরের কাছে আদর্শ অর্থাৎ মুখে শুধু তত্ত্ব উপদেশ দিয়ে মানুষকে বোঝালে চলবে না। নিজ প্রদত্ত উপদেশগুলি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হয় নিজ জীবনে। পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি মানুষকে

ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। তাই মা নারী সমাজকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ধনের প্রতি আসক্তি থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকতো। চোখে ছিল প্রসন্ন দৃষ্টি। ভোগের প্রতি, ধনের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। স্বামীর সঙ্গে থেকেও নিজস্ব কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে শ্রীমা ত্যাগের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নারী সমাজকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছিলেন।

এক বৈরাগ্যবান ভক্তের ধারণা হয় সর্ব বিষয়ে তাঁর মুখাপেক্ষিণী স্ত্রীই তাঁর ধর্ম জীবন যাপনের অন্তরায়। স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়েও যখন ব্যর্থ হলেন তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন যে তিনি (তাঁর স্ত্রী) স্বামীকে চান না ঈশ্বরকে চান। মেয়েটি ঈশ্বর পরায়ণা আবার স্বামীকেও প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই স্বামীর প্রশ্নের তখনি কোন উত্তর দিতে পারল না। মেয়েটি তারপর মায়ের উপদেশ নেবার জন্য তাঁর কাছে আসে। এই ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনে মা সেই মেয়েটিকে বলেছিলেন, "তোমার বলা উচিত ছিল, আমি ভগবানকে চাই না, আমি তোমাকেই চাই।"[২৭] দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির জীয়নকাঠিটি হচ্ছে একে অপরের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি। সেই কথাই মা ভক্তদের কাছে বিভিন্নভাবে বলে গেছেন।

সংসারের মায়া বন্ধনের বাইরে থেকে ঈশ্বর ভজনা করে শান্তি পাওয়া এক কথা আর সংসারের মধ্যে জড়িয়ে থেকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা আর এক কথা। শ্রীশ্রী মায়ের উপদেশ ছিল সংসারে যে যেমন আছ থাক তবে মায়ার বন্ধনে নিজেদের অযথা আবদ্ধ রেখ না, তাহলে দুঃখ কষ্ট বাড়বে বৈ কমবে না। একবার এক নিঃসন্তান বিধবা তার অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের স্নেহ বা কামনাবশত একটি শিশুকে লালন পালন করার ইচ্ছা নিয়ে শ্রীমায়ের উপদেশের আশায় হাজির হয়েছিলেন। মা তখন তাঁকে বলেছিলেন, "দেখ না, আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি।"[২৮] মা বিধবা মেয়েটিকে সংসারের চাওয়া পাওয়ার, দুঃখ দ্বন্দ্বের মধ্যে ঢুকতে নিষেধ করলেন।

শ্রীমা বলতেন, "সহ্যের সমান গুণ নেই।"[২৯] সংসারে আমাদের অনেককে নিয়ে চলতে হয়, মতের অমিল হতেই পারে কিন্তু সর্বংসহা পৃথিবীর মতো সব কিছুই সহ্য করতে হয়। তবেই শান্তি বজায় থাকে। মায়ের শিক্ষাই ছিল, এই সংসারে যে যেমন চায় তার সেটা যুগিয়ে যাও। ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব একেবারেই থাকবে না। এটাতে আবার সেই সহ্যের কথাতেই ফিরে আসতে হয়। আমরা যেমন খাল কেটে নদীর জল কৃষিক্ষেত্রে এনে ক্ষেত্রটিকে সবুজ ফসলে ভরিয়ে তুলি তেমনি সহ্যের খাল দিয়ে শান্তির প্রবাহ এনে আমাদের সংসারটিকে আনন্দমুখর করতে পারি।

সারদা মা শুধু স্নেহময়ী জননী ছিলেন না, তিনি ছিলেন কল্যাণময়ী ও জ্ঞানদায়িনী। একদা এক যুবতী কুপথে চলে যায়। পরে সেই যুবতী নিজের ভুল

বুঝতে পারে এবং মায়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও নিজ লজ্জাবশত মায়ের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশে ইতস্তত করতে থাকে। তখন মা স্বয়ং এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করে যুবতীটিকে বুকে টেনে নিয়ে অভয় দিয়ে বলেছিলেন, "পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্তা হয়েছ। এস আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।"[১০] তিনি এই ভাবে অনুতপ্তা পাপীকে বুকে তুলে নিয়ে পাপকেই ঘৃণা করতে শেখালেন, পাপীকে নয়।

পল্লীর আচার-বিচার মেনে চললেও অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনে মায়ের আপত্তি ছিল। বালবিধবা ক্ষীরোদবালাকে বলেছিলেন, "বাছা, অনেক কঠোরতা করেছ, আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলেছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে মা?"[১১] বালবিধবা শবাসনাদেবীকে নিরম্বু উপবাসে উন্মুখ দেখে মা বলেছিলেন, "আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আমি বলছি তুই জল খা।"[১২] সুরবালাদেবীকে বলেছেন, "আত্মা যদি কিছু খেতে চায়, আত্মাকে দিতে হয়। না দিলে অপরাধ হয়, সে কাঁদে, আমাকে দিলে না বলে।"[১৩] প্রতিটি কথা এবং আচরণের তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছেন, প্রাচীন ও আধুনিক মন ও মননের।

বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায় নারীশিক্ষা প্রসারেও মা খুব উৎসাহী ছিলেন। একদা নিবেদিতা স্কুলে বয়স্কা ছাত্রীদের দেখে তিনি খুশী হয়েছিলেন। এক স্ত্রীভক্তের অবিবাহিতা পাঁচটি কন্যার জন্য দুশ্চিন্তার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, "বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতা স্কুলে রেখে দিও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।"[১৪]

শ্রীমা বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। এতেই মায়ের আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। মাদ্রাজের দুটি কুড়ি-বাইশ বছরের অবিবাহিতা ছাত্রীদের দেখে মা খুশী হয়েছিলেন। তাদের কথা উল্লেখ করে মা বলেছিলেন, "আহা, তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছরের হতে না হতেই বলে, 'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও!' আহা! রাধুর যদি বিয়ে না হত, তাহলে কি এত দুঃখ দুর্দশা হত?"[১৫]

এই প্রবন্ধের উপসংহার লিখতে গিয়ে মায়ের সেই শেষ বাণীটির উদ্ধৃতি না দিয়ে পারা যায় না—"যদি শান্তি চাও, মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ। কেউ পর নয়, মা, জগৎ তোমার।"[১৬] বর্তমানে মানুষ যখন শুধু ছিদ্রান্বেষী হয়ে নিজের দোষত্রুটি না দেখে শুধুই অপরের সমালোচনা করছে, তখন মায়ের উপরোক্ত বাণীটি জীবনে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। হানাহানির আর বিদ্বেষের কালিমাময় ও বিভীষকাপূর্ণ সমাজে মুক্তির স্বার্থে আমাদের সকলকে এক জোট হয়ে মায়ের ঐ বাণীটি মানুষের কাছে বার বার তুলে ধরতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৩৮
২। তদেব, পৃ: ৩৮
৩। শ্রীশ্রীমা সারদামণি, মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত পৃ: ৪৭২
৪। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, পৃ: ১১
৫। তদেব, পৃ: ২৭
৬। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৩৬৬
৭। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, পৃ: ১৯২
৮। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ২২৭
৯। মাতৃ সান্নিধ্যে, পৃ: ২২৮
১০। শ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃ: ৩০৭
১১। তদেব, পৃ: ৩৬০,
১২। তদেব, পৃ: ৩৬০,
১৩। তদেব, পৃ: ৩৬০,
১৪। তদেব, পৃ: ৩৬২,
১৫। তদেব, পৃ: ৩৬১
১৬। তদেব, পৃ: ৫৫৬।

অঘোরমণি—গোপালের মা

এই মাটির ধরাধামে শ্রীভগবান বারে বারে আবির্ভূত হয়েছেন অবতার রূপে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর লীলাসঙ্গিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া এই সোঁদা গন্ধ ভরা মাটির পৃথিবীতে। আবার মহামায়া প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে এনেছেন তাঁর সহচরীবৃন্দদের। কখনো বয়স্যরূপে বা কখনো সেবিকারূপে। দ্বাপরযুগে এসেছিলেন শ্রীরাধার সহচরী রূপে বিশাখা, ললিতা, বৃন্দা, চিত্রা প্রভৃতি অষ্টসখীগণ। আর এই কলিযুগে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সঙ্গিনী সারদামাতার সাহচর্যে এসেছিলেন গোলাপ সুন্দরী, গৌরীপুরী এবং যোগীন্দ্র মোহিনী। এঁরা যথাক্রমে 'গোলাপমা', গৌরীমা' এবং 'যোগীন মা' রূপে আমাদের কাছে সমাদৃত। এছাড়া আর একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ না করলে মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয় না। তাঁর নাম অঘোরমণি। যদিও তিনি বাস্তব পক্ষে মা সারদার লীলাসঙ্গিনী ছিলেন না, তিনি ছিলেন লীলা সহায়িকা—আমাদের অঘোর মা।

দক্ষিণেশ্বরের প্রায় তিন মাইল উত্তরে পূত সলিলা জাহ্নবী তীরে কামারহাটি নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে গোবিন্দচন্দ্র দত্ত একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেই মন্দিরে শ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এই মন্দির সংলগ্ন একটি বাগানও ছিল। গোবিন্দ দত্ত ছিলেন কলকাতার অধিবাসী। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভক্তিমতী পত্নী এই গঙ্গার তীরে রাধামাধবের মন্দিরে পূজা ধ্যানে শেষ জীবন কাটাবার উদ্দেশ্যে এই মন্দিরে চলে আসেন। মাটিতে শয়ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, এক সন্ধ্যা ভোজন, ব্রত, নিয়ম, উপবাসাদি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করে ঠাকুরবাড়িতেই পবিত্রভাবে জীবনযাপন করছিলেন।

এই মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন নীলমাধব ভট্টাচার্য। অঘোরমণি নীলমাধবের ভগ্নী—বালবিধবা। অঘোরমণি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাশীনাথ ভট্টাচার্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এই কন্যার নয় বছর বয়সে সামাজিক প্রথানুযায়ী চব্বিশ পরগণা জেলার পাইন হাটি বোদরা গ্রামে একটি সৌম্যদর্শন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যেই অঘোরমণি একবার মাত্র স্বামী সন্দর্শনের পর পিত্রালয়ে অবস্থান কালেই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁর বয়স বার কি তের বছর। স্বামী যে কি বস্তু না

পারলেন জানতে না পারলেন চিনতে। একটা সন্তান থাকলেও তার হাত ধরে জীবন কাটাতে পারতেন।

অঘোরমণি বৈধব্যের বারো-তের বছর পিত্রালয়ে ছিলেন। শ্বশুরকুলের গুরুদেবকে আনিয়ে পিতৃগৃহেই তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিতা হয়েছিলেন এবং বালগোপালই তাঁর ইষ্ট। অঘোরমণি প্রায়ই গোবিন্দ দত্তের ঠাকুরবাড়িতে আসতেন। পূজা আরতি দেখতেন, ভাগবত পাঠ ও কীর্তন শুনতেন। এইভাবে কিছুদিন আসা-যাওয়া করতে থাকেন। পরে পারিবারিক জীবনের কোলাহল পূর্ণ পরিবেশ দিন দিনই তাঁর কাছে তিক্ত বোধ হতে লাগল ও মন্দিরের শান্ত পবিত্র আবেষ্টনী প্রবল ভাবে তাঁর নির্মল চিত্তকে আকর্ষণ করল। দত্ত গৃহিণীও তাঁর নিষ্ঠা ও হৃদয়ের আকুতি লক্ষ্য করে তাঁদের ঠাকুরবাড়ির বাগানের একটি নির্জন কক্ষে তাঁর থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই ভাবে তিনি প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে পিতৃগৃহ চিরতরে ত্যাগ করে ঠাকুর বাড়িতেই বাস করতে লাগলেন। শ্রীরাধা মাধবের সেবা, পূজা, জপ ও ভজন-কীর্তনে আনন্দেই তাঁর দিনগুলি কাটতে লাগল।

অঘোরমণি তাঁর শয়নকক্ষের বাতায়ন হতেই পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর প্রবাহকে অবলোকন করতেন। চিরন্তন সাগর অভিমুখী এই প্রবাহ অঘোরমণির মনকেও ভগবৎমুখী করে তুলেছিল।

রাত্রি দুই ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করে শৌচাদি সমাপনান্তে জপে বসতেন। সকাল আটটা নয়টা পর্যন্ত জপ করতেন। তারপর মন্দির পরিষ্কার করা, ফুল তোলা, চন্দন বাটা, শ্রীবিগ্রহের পূজা ও ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত করে দিতেন। পরে সামান্য উপকরণ সহ অন্নাদি রন্ধন করে কদলীপত্রে গোপালের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে সেই প্রসাদ গ্রহণ করতেন। আহারান্তে সামান্য বিশ্রাম, তারপরই আবার জপ এবং সন্ধ্যারতির পর অধিক রাত্রি পর্যন্ত ধ্যান জপ করতেন। এই ভাবে তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছর নিভৃত সাধনায় কেটে যায়।

এই সময় দক্ষিণেশ্বর শক্তিপীঠে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও তাঁর দিব্য আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকমুখে সিদ্ধসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনে তাঁকে দর্শনের জন্য অঘোরমণি ও দত্তগৃহিণী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এক শুভ হৈমন্তিক অপরাহ্নে অঘোরমণি ও দত্তগৃহিণী শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের আশায় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। ·সেদিন তাঁরা কামারহাটি থেকে নৌকায় নিয়েছিলেন। অঘোরমণির তখন বয়স ষাট কি বাষট্টি। সুদীর্ঘ নিষ্ঠাপূত সাধনায় তাঁর হৃদয় মন গোপাল ভাবে ভরপুর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের ভক্তিভাব ও মুখ মণ্ডলে পবিত্র ভাবের অভিব্যক্তি দেখে সাদরে নিজের ঘরে বসিয়ে দীর্ঘকাল ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন

এবং গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

অঘোরমণি ও দত্তগৃহিণী ঠাকুর রামকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর শান্তি প্রদায়িনী কথামৃত পান করে ও মর্মস্পর্শী গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কামারহাটি মন্দিরে শ্রীরাধামাধব দর্শনের জন্য অনুরোধ করলেন।

বিদায় বেলায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁদেরকে দক্ষিণেশ্বরে আবার আসতে বললেন। তাঁরা চলে গেলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেদিন উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর কাছে তাঁদের প্রশংসা করে বললেন, "আহা! চোখ মুখের কি ভাব—ভক্তি-প্রেমে যেন ভাসছে—প্রেমময় চক্ষু! নাকের তিলকটি পর্যন্ত সুন্দর।"[১]

কিছুকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কামারহাটি ঠাকুর বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কীর্তনানন্দে সকলকে আনন্দিত করেছিলেন। অঘোরমণিও বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন। এক দিব্য ভাবে অঘোরমণির জীবনের সুতোটি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। লীলানাট্যের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হল।

দিন দিন অঘোরমণি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি এক দুর্জয় আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, "ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধু-ভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব।"[২]

এই চিন্তা প্রবল হওয়ায় অঘোরমণি একদিন দুই-তিন পয়সায় দেদো সন্দেশ কিনে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই বললেন, "এসেছো, আমার জন্য কি এনেছ দাও।"[৩]

অঘোরমণি লজ্জায় আড়ষ্ট। কারণ তাঁর হাতের মুঠোয় আছে সস্তা দামের সন্দেশ। আর তিনি নিজের চোখে দেখছেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সামনে বসানো রয়েছে অন্যান্য ভক্তদের আনা তবকে বা রাংতায় মোড়া দামী সন্দেশ। বড় মুস্কিলে পড়েছেন এই অঘোরমণি। ঠাকুর রামকৃষ্ণও বুঝেছেন অঘোরমণির ইতস্তত করার কারণ। তাই ঠাকুর আবার চাইলেন তাঁর আঁচলের তলায় হাতের মুঠোয় রাখা খাবার। ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলতে পেরে সেই সন্দেশ তাঁকে দিলেন। ঠাকুর তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে বললেন, "তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে, লাউশাক চচ্চড়ি, আলু, বেগুন বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারী—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়।"[৪]

অঘোরমণি পরবর্তী কালে বলেন, "ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপ কেবল খাবার কথাই হতে লাগল; আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেছি—কেবল খাই খাই; আমি গরীব কাঙাল লোক—কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোনমতে

এগুতে আর পারি না। কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।"[৫]

কয়েকদিন পরেই অঘোরমণি চচ্চড়ি রেঁধে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। আসামাত্র ঠাকুর আগের দিনের মত আনন্দের সঙ্গে চেয়ে খেলেন আর বলতে লাগলেন, "আহা! কি রান্না, যেন সুধা সুধা।"[৬]

ঠাকুরকে আনন্দের সঙ্গে খেতে দেখে অঘোরমণির দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। এই সামান্য জিনিসে ঠাকুরের এত তৃপ্তি এত আনন্দ। তিনি গরীব কাঙাল বলে ঠাকুর তাঁকে দূরে সরিয়ে দেননি বরং তাঁর এই সামান্য জিনিসের কত প্রশংসা করেছেন। এখন থেকে তিনি যা রাঁধতেন ভালো লাগলেই ঠাকুরের জন্য নিয়ে আসতেন। ঠাকুরও আনন্দ করে খেতেন, আবার কোনদিন সুষনি শাক চচ্চড়ি, কলমী শাক চচ্চড়ি ইত্যাদি খেতে চাইতেন। ঠাকুরের এই খাই খাই এর জ্বালায় বিরক্ত হয়ে অঘোরমণি মনে মনে ভাবেন, "গোপাল, তোমাকে ডেকে এই হলো? এমন সাধুর কাছে নিয়ে এলে যে, কেবল খেতে চায়! আর আসব না।"[৭]

কিন্তু কি এ বিষম আকর্ষণ। একটু দূরে গেলেই তাঁর মনে হত কতক্ষণে আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করবেন ও আদর করে খাওয়াবেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তের মধুমাস। সমগ্র প্রকৃতি প্রস্ফুটিত কুসুমে আলোকিত আর সুমিষ্ট সৌরভে জীব-জগতের হৃদয় আন্দোলিত। ঊর্ধে নির্মল আকাশে বিরাজমান শুভ্র চন্দ্রকলা আর তারই আলোকে আলোকিত নিম্নে প্রবাহমানা কল্লোলিনী ভাগীরথী। একদিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে জপান্তে অঘোরমণি স্পষ্ট দর্শন করলেন তাঁর বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। বিস্ময় পুলকিত চিত্তে তাঁকে স্পর্শ করা মাত্র ঠাকুরের অঙ্গ থেকে বেরিয়ে এল গোপালের মতই নধরকান্তি দশমাসের একটি শিশু। আবার ডান হাত তুলে অঘোরমণির দিকে চেয়ে আছে। তখন গোপাল আর রামকৃষ্ণ অঘোরমণির কাছে এক হয়ে গেছে।

গোপালরূপী রামকৃষ্ণ তার কোমল হাত বাড়িয়ে আবদার করে বললেন, "মা ননী দাও"। ননী-এই কথা শুনে অঘোরমণি কেঁদে উঠলেন। ননী কোথায় পাবেন? অঘোরমণির কাছে আছে তখন বাসী নাড়ু তাই তিনি দিতে চাইছেন না গোপালরূপী রামকৃষ্ণের হাতে।

গোপালরূপী ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাগাদা দিয়ে বাসী নাড়ুই খেতে চাইলেন। মা ছেলেকে নাড়ু দেবে তার আবার বাসী-টাটকা কি! মাতৃস্নেহে বাসী টাটকা বলে কিছু নেই। অঘোরমণি গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে প্রাণ ভরে খাওয়ালেন আর কাঁদলেন মনের আনন্দে। সেই রাতে তাঁর আর জপ হল না। গোপাল তাঁর কোলে বসে মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে আবার ঘরময় নেচে নেচে ঘোরে। শ্রীবৃন্দাবন ধামে নন্দ দুলাল যেমন মা যশোদাকে ঘিরে নানা ভঙ্গিতে নাচতেন, যেমন

নেচেছিলেন বাল্যকালে গদাধর মাতা চন্দ্রমণিকে ঘিরে।

সকাল হতেই অঘোরমণি পাগলের মত গোপালকে কোলে নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে চললেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি চলতে চলতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন গোপালের লাল টুকটুকে পা দুখানি বুকের উপর ঝুলছে। 'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে অঘোরমণি দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। ভাবাবেগে তাঁর দুই চোখ বেয়ে প্রেমাশ্রু বইছে। আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। কোনও হুঁশ নেই। পাগলিনী প্রায় তিনি ঠাকুরের ঘরে ঢুকেই ঠাকুরের পাশে বসে পড়লেন আর ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হয়ে তাঁর কোলে উঠে বসলেন। বাৎসল্য প্রীতি বিহ্বল মাতা যশোদার মত অঘোরমণি প্রেমভরে নিজের আনীত খাদ্যদ্রব্য গোপালরূপী ঠাকুর রামকৃষ্ণের মুখে তুলে দিচ্ছেন আর ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিশুর মত আনন্দের সঙ্গে খেতে খেতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ভাব কেটে যায় এবং তিনি নিজের তক্তাপোষে উঠে বসলেন। কিন্তু অঘোরমণির আর ভাবের ঘোর কাটে না। তিনি আনন্দে আটখানা, ঘরময় ঘুরে ঘুরে নাচছেন আর বলছেন, "ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে" ইত্যাদি।[৮]

অঘোরমণির বর্হিজগৎ মুক্ত মানসিক অবস্থা এমন তাতে যে তিনি গোপালকে লাভ করেছেন এতে বিতর্কের অবকাশ নেই। অঘোরমণি তখন দেখছেন গোপাল কখনো শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রী অঙ্গে মিলিয়ে যায় আবার কখনো উজ্জ্বল বালক মূর্তিতে তাঁর সামনে বাল্যলীলা করে। অঘোরমণি এখন সত্যসত্যই গোপালের মা হয়ে উঠলেন আর ঠাকুরও তাঁকে ঐ নামে ডাকা শুরু করলেন।

ভাব প্রশমনের জন্য ঠাকুর গোপালের মার বুকে হাত বুলোতে লাগলেন ও সারাদিন নিজের কাছে রেখে সেবা যত্ন করলেন। গোপালের মা কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে বললেন, "বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এ জন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েছে, টেকো ঘুরিয়ে সুতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েছে, তাই বুঝি আজ এত যত্ন করচো!"[৯]

সন্ধ্যার পূর্বেই গোপালের মা তাঁর গোপালকে বুকে করে বাড়ি ফিরলেন।

সন্ধ্যার পরে যথারীতি অঘোরমণি জপে বসলেন কিন্তু জপ করা আর হল না। যাঁর জন্য জপ সেই তখন তাঁব কোলে বসে খেলা করছে, তাহলে আর জপ হবে কি করে? অবশেষে অঘোরমণি জপ ছেড়ে গোপালকে পাশে নিয়ে তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়লেন। দুঃখিনী অঘোরমণির বিছানার কোন পারিপাট্য ছিল না। বালিশ না থাকায় গোপালের ঘুম আসে না। অঘোরমণি তখন নিজের হাতের উপর গোপালের মাথা রেখে আদর করে বললেন, "বাবা, আজ এই রকমে শো;রাত পোয়ালেই কাল কলকেতা গিয়ে ভূতোকে (গিন্নির বড় মেয়ে) বলে তোমায় বিচি ঝেড়ে বেছে নরম বালিশ করিয়ে দেব।"[১০]

অঘোরমণি বাগানের শুকনো কাঠ পাতা কুড়িয়ে আনতেন এবং রান্না করতেন। কাঠ পাতা কুড়াবার সময় তিনি দেখতেন, গোপালও এসে তাঁকে এই কাজে সাহায্য করছে। রান্নার সময় দুরন্ত গোপালের দুষ্টামির শেষ নেই। অঘোরমণি কখনো মিষ্ট কথায় তাকে শান্ত করছেন, আবার কখনো মৃদু তিরস্কার করে তাকে জড়িয়ে ধরছেন। এইভাবে অঘোরমণির প্রায় দুমাস তাঁর ইষ্ট দেবতা গোপালের সেবা যত্নে কেটে যায়।

কিছুদিন পর অঘোরমণি একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে তিনি নহবতে শ্রীশ্রীমার ঘরে জপ করতে বসলেন। জপ শেষে প্রণাম করে উঠছেন এমন সময় দেখলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি অঘোরমণিকে নিরন্তর জপ করতে বারণ করে বললেন, "তোমার নিজের জন্য জপ-তপ সব করা হয়ে গেছে, তবে (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয় তো করতে পার।"[১১]

ঠাকুরের শ্রীমুখের পূর্বোক্ত আশ্বাসবাণী শ্রবণ করে অঘোরমণি জপের মালা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু অবসর সময় কাটাবার জন্য কিছুদিন পরে আর একটি মালা কিনে জপ করতে লাগলেন।

দীর্ঘ কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে অঘোরমণি গোপালরূপী রামকৃষ্ণকে পেয়ে গোপালের মা হয়ে সাধন জগতের উচ্চমার্গে উত্তীর্ণ হলেন। আজ সাধিকা অঘোরমণির আঁচলে বাঁধা পড়ল তাঁর হৃদয়ের ধন সর্বসন্তাপনাশী শ্রীকৃষ্ণ। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ ধরে এই সাধিকাকেই সেই চির আনন্দের বাণী শুনিয়েছেন যে তার সাধনমার্গের শেষে সন্তানরূপে তাঁর কোলেই আশ্রয় নিয়েছেন।

আকর গ্রন্থ নির্দেশ ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, স্বামী সারদানন্দ, দ্বিতীয় ভাগ।

১। তদেব, পৃ: ১২৯
২। তদেব, পৃ: ১৩২
৩। তদেব, পৃ: ১৩২
৪। তদেব, পৃ: ১৩২
৫। তদেব, পৃ: ১৩২
৬। তদেব, পৃ: ১৩২
৭। তদেব, পৃ: ১৩৩
৮। তদেব, পৃ: ১৩৫
৯। তদেব, পৃ: ১৩৫
১০। তদেব, পৃ: ১৩৬
১১। তদেব, পৃ: ১৩৬

'শাস্ত্রে নারীমাহাত্ম্য'

অতি সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় ধর্ম, নীতিশাস্ত্র ও সমাজ নারীকে এক অতুলনীয় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতীয় ধর্মে মাতৃরূপী শক্তিকেই প্রধান এবং প্রাথমিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য দেশের ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রে নারীর এই মহিমময়ী প্রতিষ্ঠার এত বড় স্বীকৃতি দেখা যায় না।

নারী জাতির সমাদর সম্বন্ধে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্ত ত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।

অর্থাৎ যেখানে নারী জাতির পূজা হয়, আদর সম্মান হয় সেখানে দেবতারা সদা সর্বদা বাস করেন। যেখানে তাদের পূজা হয় না, সেখানে সব ধর্ম, কার্যানুষ্ঠান ইত্যাদি বিফল হয়ে যায়।

চণ্ডীসপ্তসতী এবং দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবী ভেদাঃ।
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।।
যা যাশ্রচ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্বৌঃ
প্রকৃতি কলাঃ।
কলাংশাংশ সমুদ্রভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু
যোষিতাঃ।।

অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যা আর সকল স্ত্রী দেবীরই রূপ। সমস্ত গ্রাম্য দেবীরা আর বিশ্বাস্থিত স্ত্রীলোকেরা প্রকৃতিমাতারই অংশরূপিণী।

গীতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—

কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা'—

উল্লেখিত ঐশ্চর্যগুলি স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরই বিশেষণ বা তাদের গুণবাচক। তাই এইগুলির মধ্যে যে কোন একটি বা একাধিক গুণ তথা ঐশ্চর্যের অধিকারিণী নারী জগতে মহিমান্বিতা হয়ে থাকেন।

বেদ পুরাণের যুগে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত। জ্ঞানার্জনে,

জ্ঞানবিতরণে গুণবতী নারী এবং গুণবান পুরুষে কোনও পার্থক্য ছিল না। দক্ষতার মানদণ্ডে উভয়েই বিচার্য।

ঋগ্বেদে যে সব মহিলা ঋষি ছিলেন তাঁদের মধ্যে সাত জনের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। যেমন, অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা, অত্রিকন্যা, বিশ্ববারা ও অপালা, কাক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা, সূর্যা ও ইন্দ্রানী এবং অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্। এঁরা সকলেই মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। এঁদেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা হলেন বাক্‌দেবী।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিতৈ্যরুত বিশ্বদৈবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহমিদ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা

অর্থাৎ আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসু রূপে বিচরণ করি। দ্বাদশ আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণ আমারই নানা অভিব্যক্তি। মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয়কে এবং অশ্বিনীকুমার যুগলকেও আমি ধারণ করে আছি।

উপরোক্ত শ্লোকটির দ্রষ্টী এই বাক্‌দেবী এবং এটি চণ্ডীপাঠের অন্তর্গত। এখানে বোঝা যায় যে, পরম ব্রহ্মকে তিনি মাতৃরূপেই আরাধনা করেছেন এবং নিজের মধ্যেও সেটিকে উপলব্ধি করেছেন।

উপনিষদের যুগে তীক্ষ্ণধী, জ্ঞানী এবং বিদুষী মহিলাদের মধ্যে গার্গী এবং মৈত্রেয়ী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত জনকের রাজসভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের বিতর্কের কথা সর্বজনবিদিত। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য যেমন প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে নিজের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন তেমনি প্রশ্নের গভীরতা থেকেও প্রশ্নকর্তারও 'সমূহ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তর্কশেষে গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে যেমন স্বীকৃতি দিলেন তেমনি তাঁর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ করে নিজেও বিদুষী মহিলা রূপে প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেলেন।

আবার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর পার্থিব সম্পত্তি দুই পত্নীর মধ্যে ভাগ করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ী অমরত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনায় ধনরত্নের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহাই জানতে চাইলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের অধিকারী হলেও সেই ব্যক্তি অমরত্ব লাভ করতে পারে না।" এই কথা শুনে মৈত্রেয়ী স্বামীর কাছ থেকে তাঁর কেবলমাত্র সাধনালব্ধ জ্ঞানটির উত্তরাধিকারিণী হতে চেয়েছিলেন।

মৈত্রেয়ী ঠিকই বুঝেছিলেন যে জাগতিক সম্পদই বন্ধনের কারণ এবং মুক্তির পথের অন্তরায়। তাই তিনি হাসি মুখে সর্ব সম্পদ এবং জাগতিক সুখ পরিত্যাগ করে আসল পথের নিশানা জানতে চেয়ে নারীসমাজে খ্যাতিমতী হয়ে আছেন।

প্রাচীন যুগের শাস্ত্র পুরাণের পাতা উল্টালে আমরা দেখতে পাই অনেক শাস্ত্রজ্ঞা নারী নিজ জ্ঞান বুদ্ধিমত্তার জন্য সমাজে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সমকক্ষ বা তাঁদেরও ছাড়িয়ে অনেক উচ্চে নিজেদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রাচীন যুগের এই সব মহীয়সী নারীরা অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করে পতি ও পুত্র কন্যাদের এবং অন্যান্য প্রিয়জনদের এই জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রেরণা দিয়েছেন এবং প্রয়োজন হলে জ্ঞানও দিয়েছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মদালসা ছিলেন রাজদুহিতা এবং পরবর্তী জীবনে ইনি হন রাজগৃহিণী। পরম বৈভবের মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর পুত্রদের শৈশবাবস্থা হতেই পরম জ্ঞানটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে দিয়ে আসতেন। তাই শিশু পুত্ররা মাতৃ উপদেশে জাগতিক আকর্ষণ মুক্ত হয়ে ওঠে। মাতৃ উপদেশে তারা বুঝেছিল আত্মা সদাই শুদ্ধ ও আনন্দময় এবং ভোগকে সুখের কারণ মনে করা মূর্খতা মাত্র।

ভারতের নারী আদর্শের সর্বকালীন ধারাটি আমরা খুঁজে পাই রামায়ণের সেই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে, যেখানে রয়েছেন সীতা, শবরী, বিভীষণপত্নী সরমাও।

সীতাচরিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সর্বাগ্রে মনে পড়ে বিদেশ প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের মাদ্রাজে প্রদত্ত সেই বিখ্যাত ভাষণটি, যেটি সীতা সম্পর্কে এতই স্বয়ংসম্পূর্ণ যে সেটির উদ্ধৃতির একান্ত প্রয়োজন অনুভব করছি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়:—"সীতাচরিত্র অসাধারণ..... ভারতীয় নারীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ, নারীচরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতা হইতেই উদ্ভূত... মহামহিমময়ী সীতা সাক্ষাৎ — পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন সেই নিত্যসাধ্বী নিত্যবিশুদ্ধভাবা আদর্শ পত্নী সীতা, সেই নরলোকের—এমনকি দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শ স্বরূপা মহীয়সী সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতা রূপে বর্তমান থাকিবেন। .....ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।"

(স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮-৪৯)

মহাভারতের আখ্যানের উজ্জ্বল নারীচরিত্রগুলিকে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তাঁরা যেমন একদিকে পতিনিষ্ঠায় অনন্যা তেমনি অপর দিকে তাঁরা তেজস্বিতা ও কোমলতার গুণে ভরপুর।

পতিব্রতা স্ত্রীর দৈনন্দিন ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত তা আমরা সত্যভামার

সহিত দ্রৌপদীর কাম্যকবনে কথোপকথনের মধ্য থেকেই জানতে পারি। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী কিন্তু সকলের নিকটই দ্রৌপদী সমভাবেই প্রিয়। তাই সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেন, "তুমি পাণ্ডবদের বশ করেছো কি কামশাস্ত্র প্রয়োগ করে বা কোন মন্ত্র বা ঔষধের দ্বারা?"

এই প্রশ্ন শুনে দ্রৌপদী প্রথমেই প্রশ্নের ধরনটিতে একটু কটাক্ষ প্রকাশ করে বললেন, "সখি, তোমার জানা উচিত নিম্ন জাতির স্ত্রীরাই ঐরূপ বিদ্যা স্বামীদের উপর প্রয়োগ করে স্বামীদের বশ করার চেষ্টা করে। তবে আমি ঐ প্রথার কোনটিই গ্রহণ করিনি। আমি স্বামীদের সহিত প্রকৃত স্ত্রী সুলভই আচরণ করি। তাঁদের পরিচর্যার ভার ঝি-চাকরদের উপর না রেখে নিজেই সেই কাজ সম্পন্ন করি। স্বামী গৃহে আগমন করলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্বামীর আসন গ্রহণে সাহায্য করি। নিজের ক্ষুৎ-পিপাসা দূরে রেখে স্বামীর আহারের পূর্বে কখনই আহার করি না। স্বামীর কাছে কখনই নিজের ক্রোধ প্রকাশ করি না। এমন কি সপত্নীদের সঙ্গেও আমি সুখে আছি এই ভাবেই আমি স্বামীদের নিকট প্রণয় প্রকাশ করে থাকি।" এই ভাবে দ্রৌপদী সত্যভামাকে আরও কিছু সুন্দর উপদেশ দেন যেগুলি সত্যভামাকে কেন সমগ্র স্ত্রীকুলের পক্ষে আদর্শ উপদেশ হয়ে আছে।

বৌদ্ধ যুগেও নারীরা উচ্চ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে ক্ষেমা, সুমেধা, পটাচারা প্রভৃতি মহীয়সী নারীর নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের বিমাতা ও মাতৃস্বসা রাজ্ঞী গোতমী স্বয়ং বুদ্ধদেবের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় এবং নারীজাতি আধ্যাত্মিকতার অধিকার লাভ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব-সহধর্মিণী ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী ভক্তি, কঠোর কৃচ্ছ্রতাময় জপতপ পরায়ণ জীবন মধ্যযুগীয় ভারতের নারী ঐতিহ্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। স্বার্থচিন্তা বিস্মৃত হয়ে তিনি জগৎ কল্যাণে স্বামীকে গৃহত্যাগে সম্মতি জানিয়েছেন। নিজে অন্তঃপুরচারিণী থেকে স্বহস্তে অতিশয় নিষ্ঠা ভক্তির সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ী, গৃহদেবতা রঘুনাথ, অতিথি-অভ্যাগত ও ভক্তজনের সেবায় জীবন অর্পণ করেছেন এবং অবসর কালটুকু ভগবদারাধনা ও জপ ধ্যানে ব্যয় করেছেন। উত্তরকালে তাঁর সাধন-ভজনের মাত্রা, জীবনযাপনের কঠোরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। প্রাতঃকালে স্নানান্তে শালগ্রামে তুলসী মঞ্জরী নিবেদন, বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত 'হরে কৃষ্ণ' নাম জপ, তৎপরে ষোড়শ সংখ্যক জপের দ্বারা পবিত্রীকৃত হত যেকটি তণ্ডুল, স্বহস্তে তা রন্ধন ও ভোগ নিবেদন, প্রসাদ গ্রহণ, প্রসাদ-বিতরণ, ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ—এই রূপ নিষ্ঠাময় জীবন অনলস ভাবে যাপন করেছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে ভক্তগণের ভক্তি সাধনার সহায়ক রূপে শ্রীচৈতন্য-পূজার পথ নির্দেশ করেছেন।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব—স্বামী সারদেশনন্দ, পৃঃ ৩৩৯-৪১)

মধ্যযুগের ইতিহাসে রাজকুলবধূ মীরাবাঈ-এর গিরিধারীর প্রেমে আত্মোবিলোপনের ঘটনা সকলেরই জানা। "মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরা ন কোঈ। আমার কাছে শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেউ আমার দোসর নেই। যার মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাপ, মা ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন।

অষ্টাদশ শতকে মহারাষ্ট্রের মহারাণী অহল্যাবাঈ-এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল শোকতাপে ভরা। কিন্তু তিনি সে সবই শিবসুন্দরের চরণ-কমলে পুষ্পাঞ্জলির মত সমর্পণ করে শিব সাধনায় নিজেকে মগ্ন রেখেছিলেন। তিনি সংসার জীবনের উর্ধ্বে এক স্বর্গীয় আনন্দধামে বসবাস করতেন আর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা মহেশ্বরের শরীরে লীন হয়ে যান।

ওঁ-কারেশ্বরের মন্দিরের ভিতরের দেওয়ালে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি খোদাই করা আছে। সেই মূর্তিতে তাঁর ম্লান গম্ভীর মুখ, ললাটে অজস্র দুঃখ—শোকের ছাপ, সর্বাঙ্গে স্তব্ধ বেদনার ছায়া, সন্নত দুই চোখে কিন্তু অপার করুণা ও মমতা যেন ঝরে পড়ছে দুই চোখ হতে। হাত দু'খানি বুকের কাছে, বাম হাতের উপর ডান হাতটি ন্যস্ত, তাতে একটি শিবলিঙ্গ ধরে রেখেছেন। শিবগতপ্রাণা এই মহিয়সী দেবীমূর্তি যেন কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের চরণে আর্তি জানাচ্ছেন—

প্রভু দক্ষিণা লও আমারে
দিবার আমার নাই কিছু গো,
শুধু তুমি আছ
মোর ভাণ্ডারে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে যে গুণবতী নারীরা সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও রুচি সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নয় তবে তাঁদের মধ্যে পুণ্যশ্লোকা অণ্ডালের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণপ্রেমে জর্জরিতা অণ্ডালের কৃষ্ণভক্তি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় দ্বাপর যুগের গোপিনীবৃন্দকে, যাঁরা কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হয়েছিলেন।

কলকাতার ভক্তিমাতা রাণী রাসমণি (১৭৯৩-১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ), স্বামীর মৃত্যুর পর সুষ্ঠুভাবে জমিদারি পরিচালনায় পারদর্শিতা ও তার পাশাপাশি পরহিতে দান ধ্যান ও ঠাকুর দেবতায় অবিচল নিষ্ঠা তাঁকে এক মহীয়সী নারীর সম্মানে অধিষ্ঠিত করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধিকা—শ্রীসারদামণি ত্যাগ তিতিক্ষা এবং লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগের ফলে সকলের কাছে বরণীয়া হয়ে আছেন।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নারী তাঁদের কৃত-কর্ম দ্বারা নারী সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

করে গেছেন এবং তাঁরা সমাজের কল্যাণ-কর্মে আত্ম-নিয়োগ করে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে আছেন।

এই বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে নারী জাগরণের যে স্রোত শুরু হয়েছিল তা আজ উত্তাল হয়ে সমুদ্রের কলরোলে পর্যবসিত। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, স্থাপত্যে, কারুশিল্পে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও সংগঠনে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, যন্ত্রশিল্পে এবং ব্যবহারিক জীবনে সর্ব দিকে নারী আজ অগ্রগণ্যা। প্রগতির ধ্বজা ধরে প্রধানত পুরুষশাসিত এই ব্যবস্থায় পুরুষের একক আধিপত্য আজ আর নেই। নারী আজ সামাজিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের সাথে সমান করে ভাগ করে নিয়ে এক যুগ্ম সমাজের সৃষ্টি করেছে।

ঐতিহাসিকেরা বা সমাজ বিশারদরা হয় তো বলবেন যে পুরাকালের নারীরা ছিলেন সনাতন পন্থী। তাঁরা যে ক'জন পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন জপ-তপ-পূজা কিংবা দর্শনের জ্ঞানে বিভূষিতা। তাঁরা কেউই সমাজের ব্যবহারিক জীবনের ব্যবহারিক উন্নতির হাল ধরে বিখ্যাত হন নি। এটা বুঝতে হলে আমাদের স্বীকার করতে হবে মানব সভ্যতা একদিনে বর্তমানে আসে নি। বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তিগত উন্নতি ক্রমশ উন্নতির ধাপে এগিয়েছে বা এগুচ্ছে। এই গতি কখনও শ্লথ বা কখনও দ্রুত। গাছ তার শিকড়গুলি একদিনে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। মূল শিকড়ই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তার শাখা শিকড়গুলি বিস্তার করে। তেমনি পুরাকালের সেই বিদুষী নারীরা হতে পারে সনাতন পন্থী কিন্তু আজকের সমাজের সফল নারীদের অনুপ্রেরণা তাঁরাই। যেমন শাখা শিকড়ের বর্ধন ও পরিপুষ্টির জন্য বীজের অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট সেই মূল শিকড়।

বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে সমস্ত মায়েরা ঘরের বাইরে এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই মাতৃত্ববোধে ঘরে রেখে আসা সন্তানের জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকেন। তাই এ কথা সর্বকালেই সত্য যে নারীরা সমাজের যে কোন দায়িত্বেই থাকুন না কেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি 'মা'। এর ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ব্যতিক্রমই সাধারণ নিয়ম নয়।

গিরিধারী ও মীরাবাঈ

আমরা জাগতিক মানুষ, জাগতিক লোভ মোহ এবং মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু এই বন্ধন ছিঁড়ে যাঁরা সেই নিত্য পরমপুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছেন তাঁরা পরম শান্তি ও তৃপ্তির সমুদ্রে অবগাহন করেছেন। এই সাধকদেরই আমরা দেখেছি বিভিন্নকালে ও স্থানে। এই রকমই সাধিকা শিরোমণি ছিলেন মীরাবাঈ। যাঁর কথা আমরা মাঝে মাঝে স্মরণ করে প্রেরণা লাভ করি। আত্ম- নিবেদনের ইতিহাসে মীরাবাঈ এক ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। 'মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরা ন কোঈ'। যাঁর মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট সেই আমার স্বামী, আমার সর্বস্ব। বাপ, মা, ভাই বন্ধু কেউ আমার স্বজন নয়। গিরিধারীই আমার স্বজন।

সাধিকা মীরাবাঈ জন্মেছিলেন মেড়তার কাছে কুড়কি গ্রামে। তিনি জন্মেছিলেন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে। সূর্য তখন মেষরাশিতে, তাই সূর্যের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হল 'মিহিরা', মিহিরা থেকেই অপভ্রংশে মীরা।

বাল্যকালে কোন এক প্রতিবেশির কন্যার বিবাহোৎসব দেখে নিজের মাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার স্বামী কে? মা কৌতুকচ্ছলে নিজেদের গৃহদেবতার বিগ্রহকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'এই গিরিধারীলাল তোর স্বামী।' বালিকা মীরাবাঈ সেই দিন থেকেই গিরিধারীলালকে স্বামী জেনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ও ভক্তি দিয়ে পূজা করতে আরম্ভ করেন।

কয়েকমাস পরের কথা। এক প্রবীণ বৈষ্ণব সাধু এসে মীরাবাঈ-এর পিতা রাঠোর রতন সিংহের গৃহে অতিথি হন। সাধুর ঝুলিতে রয়েছেন তাঁর ইষ্ট বিগ্রহ গিরিধারী গোপাল। এই গোপাল তাঁর জীবন সর্বস্ব, নয়নমণি। তাঁর নিত্য সেবা করাই সাধুর সাধনার প্রধান অঙ্গ। গিরিধারীজীর সুন্দর মূর্তিটি দেখে রতন সিংহের কন্যা মীরাবাঈ আবদার করেন সেই মূর্তিটি পাবার জন্য। সাধু প্রথমে সেটি দিতে চাননি, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতেই সাধু গভীর রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে শুনতে থাকেন মীরাবাঈ-এর কণ্ঠস্বর, তাঁর আর্তি, তিনি অনুভব করেন গিরিধারীজীও যেন মীরাবাঈ-এর কাছেই থাকতে চান। মহাযোগী অগত্যা সেই গিরিধারীলালের বিগ্রহ মীরার হাতে সমর্পণ করেন।

এখন থেকেই গিরিধারী গোপাল হয়ে ওঠেন মীরার জীবনসর্বস্ব, দিবারাত্র

মীরা খেলা করেন তাঁর পরমপ্রিয় গিরিধারীর সঙ্গে, মনোহর পুষ্প চয়ন করেন তাঁর জন্য, প্রেমভরে গাঁথেন অজস্র অপরূপ মালা আর প্রাণভরে শোনান তাঁকে স্বরচিত গান।

ধীরে ধীরে মীরার বালিকা জীবনে রোপিত হয় কৃষ্ণপ্রেমের এক অমোঘ বীজ। সে বীজের অঙ্কুরিত পুষ্পিত ও ফলিত রূপই কৃষ্ণ পাগলিনী, কৃষ্ণপ্রেমসিদ্ধা মহাসাধিকা মীরাবাঈ। হৃদয়ের আসনে বসিয়েছেন তাঁর ইষ্টকে, নব-কিশোর নটবর ব্রজেন্দ্র নন্দনকে। তাঁর আরাধ্য দেবতার চরণে নিজেকে তিনি নিঃশেষে নিবেদন করে দেন। এই ভাবে বিশ্বস্বামী মীরার পার্থিব স্বামীর আসন আগেই দখল করে বসলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মীরার রূপগুণ এবং ভুবনমোহিনী সঙ্গীত-খ্যাতি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে দূর-দূরান্ত হতে লোকে মীরাকে দর্শন এবং তাঁর গান শুনে চরিতার্থ হবার জন্য কুড়কি গ্রামে এসে ভীড় করতে লাগলেন। মেড়তা মাড়োয়ারের একটি তীর্থ স্থানে পরিণত হল।

চিতোরের মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্র ভোজরাজ মীরার সুখ্যাতি শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হলেন এবং একদিন ছদ্মবেশে মীরার পিতৃগৃহে গিয়ে মীরার রূপ দেখে এবং গান শুনে মুগ্ধ হলেন। দু'তিন দিন অতিথি হিসাবে থাকার পর বিদায় নেবার সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে মীরার অঙ্গুলিতে একটি মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয় পরিয়ে দিতে দিতে বললেন, "মীরা, তোমার সঙ্গ স্বর্গসুখতুল্য, মনোহর। এই স্বর্গ ছেড়ে চিতোর যেতে মন চাচ্ছে না। তুমি যদি চিতোরের ভবিষ্যৎ রাজমহিষী হতে স্বীকার করো তাহলে চিতোর ও মহারাণার কুল ধন্য হয়।"

চিতোরের মহারাণার প্রথম পুত্রের মহিষী হয়ে চিতোরে পদার্পণ করলেন মীরা। রূপে তিনি অনিন্দনীয়া, সংগীতে পারদর্শিনী, ভজন গান রচনায় তাঁর জুড়ি নেই। স্বভাবতই তাই অল্পকালের মধ্যে রাজপ্রাসাদের মধ্যমণিরূপে গণ্যা হলেন তিনি। রাজ-ঐশ্বর্য, প্রাসাদের বিপুল বৈভব আর শ্বশুরকুলের স্নেহ-সমাদরের মধ্যে মীরা কিন্তু নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেললেন না। পতির আদর সোহাগ যেমন স্বাভাবিক ভাবে মীরা গ্রহণ করেন তেমনি সোৎসাহে যোগদান করেন প্রাসাদের সকল উৎসব ও আনন্দরঙ্গে। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে গিরিধারী গোপালের আকর্ষণ রয়ে যায় তেমনি দুর্বার। প্রাসাদে সাধুসন্তের আগমন হলেই মীরা ছুটে যান সর্বাগ্রে তাঁদের কাছে, আত্মহারা হয়ে শোনেন তাঁদের মুখে হরি-কথা। কখনো কখনো ভাব প্রমত্ত হয়ে নিজের কণ্ঠে শুরু করেন অমৃতময় ভজন গান।

অন্তর মন্দিরে জাগো জাগো
মাধব কৃষ্ণ গোপাল
নব অরুণ সম জাগো হৃদয়ে মম
সুন্দর গিরিধারীলাল।।

মীরা যেভাবে দিন দিন ইষ্টের জন্য পাগলিনী হয়ে উঠেছেন তাতে তো আর বেশীদিন সামলানো যাবে না। ভোজরাজ একদিন একান্তে বসে পরম স্নেহভরে পত্নীকে বললেন, "মীরা, তোমার প্রাণের বেদনা, প্রাণের আকুতি আমায় খুলে বলো। তুমি কি চাও? কি পেলে তুমি খুশী হবে, শান্তিলাভ করবে? অকপটে আমায় জানাও।"

পত্নীর হৃদয় বেদনার উৎস কোথায় সে কথা বুঝতে কুমার ভোজরাজের দেরী হয় না। মীরার জীবনে এসেছে সেই প্রেমের মহাপ্লাবন যা ঘর সংসার তো দূরের কথা, সারা বিশ্বসংসারকে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

মীরার শ্বশুরকুল শৈব। জন প্রবাদ এই যে, মীরা শ্বশুরবাড়ীতে আনীত হলে তাঁকে কুলদেবতা মহাদেবকে যখন প্রণাম করতে বলা হয়, তখন তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "এক গিরিধারী ছাড়া আর কাউকে প্রণাম করি না।"

সেই দিন থেকে শুরু হয় মীরার কপালে লাঞ্ছনা ভোগ। চারিদিকে কেবল নিষেধের বেড়াজাল, এমন গলা ছেড়ে গান গাওয়া রানীর সাজে না এবং ঠাকুর নিয়ে পড়ে থাকা যোগ্য নয়, সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা চলবে না ইত্যাদি। মীরা দুঃখে ও ব্যথায় ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন।

তিনি সদা-সর্বদা হরি সংকীর্তনে মত্ত থাকায় স্বামী সেবায় ব্যাঘাত ঘটতে লাগল, রাণা রুষ্ট হলেন।

মীরা বৈষ্ণব মহাত্মা পেলেই তাঁর সঙ্গে ভজন কীর্তনে মেতে ওঠে, এতে রাণা মীরার চরিত্রে সন্দেহ করতে লাগলেন। এই সন্দেহের আগুনে বাতাস দিতে লাগলেন মীরার ননদ শ্রীমতী উদাবাঈ। মীরার উপর দিনরাত গঞ্জনা ও নির্যাতন চলতেই থাকল। তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুর গিরিধারীলালকে বুকে আঁকড়ে ধরে সব ব্যথা নীরবে সইতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে মীরার স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর দেবর বিক্রমজিৎ মহারাণা হলেন। মীরা দিবারাত্র গিরিধারীর সেবায় ও ভজনে মত্ত থাকতেন বলে মহারাণা তাঁর উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মহারাণা বিক্রমজিৎ মীরার সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ ও সাধন ভজনে নানারকম বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। ননদ উদাবাঈ-এর অত্যাচার চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তাই যখন—

লোকে বলে মীরা পাগলিনী।
রাণা বলে মীরা কলঙ্কিনী।

বার বার তারা মীরাকে কৌশলে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণগত প্রাণা মীরাকে তাঁর প্রভু বার বার রক্ষা করেন। মীরার ভজনে যে কাহিনীর বর্ণনা আছে তা এই যে, মীরাকে মেরে ফেলবার জন্য ফুলের ঝাঁপিতে ফুলের মধ্যে কালসর্প পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর প্রাণঢালা ভক্তির গুণে তিনি ঝাঁপির মধ্যে

পেলেন শালগ্রামশিলা। এই অলৌকিক কাণ্ড দেখেও মহারাণা এবং তাঁর ভগ্নির চোখ খুলল না, চৈতন্যোদয় হল না। তাঁরা সত্যসত্যই একদিন ঠাকুরের চরণামৃত বলে মীরাকে বিষ খাওয়ালেন। চরণামৃত ভেবেই মীরা সাগ্রহে বিষপান করেছিলেন, কিন্তু তাতে মহাসাধিকার কিছুই হল না। প্রিয়ের অমৃতস্পর্শে বিষ পরিণত হল অমৃতে। বরং তাঁর ভগবৎ প্রেমের মাদকতা আরও বেড়ে গেল। মীরার প্রিয়তম গিরিধারী তাঁর সহায়, তিনি তাঁকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাই মীরা ডুবে আছেন তাঁর প্রিয়তমের নাম গানে, মন পড়ে আছে প্রভুরই উপর।

মহাযোগিনী মীরাবাঈ-এর সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল মহাত্মা তুলসীদাসজীর। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী মীরা যখন তাঁর দেবরের অত্যাচারে, অতিষ্ঠ হয়ে গোবিন্দ ভজনে বাধা পাচ্ছেন তখন তিনি দুঃখদুশ্চিন্তায় একেবারে ভেঙে পড়েন। এই অবস্থায় কি তাঁর করণীয় তা' জানার জন্য তিনি তুলসীদাসজীর কাছে পত্র লিখলেন—

'শ্রীতুলসী সুখ নিধান, দুখহরণ গুঁসাই,
পায়ের পর প্রণাম করু, অবহরো শোকসমুদাই।
ঘরকে স্বজন হমারে যেতে সবনে উপাধি বাড়াই,
সাধু সঙ্গ অরু ভজন করত মোহি দেত কলেশ মহাই।
বালপনসে মীরা কীনহা গিরিবরলাল মিতাই,
সো তো ছুটতে নহি কৈঁসে, লগন লগি বরিয়াই।
মেরে মাতাপিতাকে সমহো, হরিভক্ত না সুখদাই,
হমকো কহা উচিত করিকে হয় যো লিখিয়ে সমঝাই!

অর্থাৎ হে দুঃখহরণ সুখনিধান গোস্বামী তুলসীদাসজী। আমি বারংবার তোমাকে প্রণতি জানাচ্ছি। তুমি আমার সকল শোক হরণ করো। আমার স্বজন আমার মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করছে, তারা আমাকে ভজন ও সাধুসঙ্গ করতে ক্লেশ দিচ্ছে। শৈশব হতে মীরা গিরিধারীলালের সঙ্গে প্রেম করছে এবং তা ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও তা এখন ছাড়তে পারি না। তুমি আমার পিতামাতাসম এবং তুমি হরিভক্তদের পরম মঙ্গলাকাঙ্খী। তুমি আমাকে বুঝিয়ে লিখে পাঠাও, এ অবস্থায় আমার কি করা উচিত।

এর উত্তরে গোস্বামী তুলসীদাসজী যা লিখে পাঠিয়েছিলেন—

"যাকে প্রিয় না রামবৈদেহী।
তাজিয়ে তায় কোটি বৈরীসম, যদ্যপি পরম সহেহী
তজে পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতরী
বলি গুরু তজে, কান্ত ব্রজবণিতা ভয়ে সব মঙ্গলকারী
না তো নেহ রাম সো মণিয়ত, সুহৃৎ সুদেব্য সহাঁলো

অঞ্জন কঁহা আঁখ সে ফুটে বহুতক্ কাঁহা কহালো
তুলসী! যো সব ভাঁতি পরমহিত, পুজ্য প্রাণতে প্যারো
যা সোঁ হোয় সনেহ রামপদ এহি মতো হমারো।"

অর্থাৎ মা মীরা, তোমার রাম নাম নেওয়ার পথে যে বাধা জন্মায়, সে যদি তোমার পরম স্নেহের পাত্রও হয় তবুও তুমি পরম শত্রু ভেবে অবিলম্বে ত্যাগ করবে। শ্রীহরির জন্য প্রহ্লাদ তার পিতাকে ত্যাগ করেন, বিভীষণ তার দাদা রাবণকে ত্যাগ করেন, ভরত ভগবান রামচন্দ্রের জন্য তার মাতাকে পরিত্যাগ করেন, বলিরাজা ভগবান বিষ্ণুর জন্য গুরু শুক্রাচার্যকে ত্যাগ করেছিলেন, আর ব্রজগোপিরা ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন, তাতে তাদের মঙ্গল হয়েছিল। চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগালে চোখের দীপ্তি উজ্জ্বল হয় এবং রামপদে ভক্তি বাড়াবার জন্য যদি পরম সুহৃদকেও ত্যাগ করতে হয় তবে তাও ত্যাগ করবে, আর তোমাকে কত বোঝাব? যে সব কাজ করলে রামের উপর তোমার অচলা ভক্তি হয় তা তুমি অবিলম্বে করবে—এই আমার মত।

তুলসীদাসজীর এই নির্দেশ পেয়েই মীরা আনন্দিত চিত্তে গিরিধারীলালকে বুকে নিয়ে চিরকালের জন্য চিতোর ত্যাগ করলেন। পিছনে পড়ে রইল তাঁর রাজসুখ আর রাজ ঐশ্বর্য।

বৃন্দাবনে এসেই সাধিকা মীরা অপূর্ব প্রেমাবেশে অধীর হন, অপার ঔৎসুক্য নিয়ে প্রভু শ্যামল কিশোরের নানা লীলাস্থানসমূহ দেখে তিনি বেড়াতে থাকেন। ইষ্টমন্ত্র গাইতে গাইতে প্রেমপ্রমত্তা কৃষ্ণময়ী মীরা শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজন কুটিরে এসে তাঁর দর্শন প্রার্থনা করলেন। গোস্বামী বলে পাঠালেন, "আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী, আমি প্রকৃতি সম্ভাষণ করি না।"

এই বার্তা শুনে মীরা বলে পাঠান, "আমি জানতুম বৃন্দাবনে একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই পুরুষ আছেন। তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ পুরুষ আছেন তা আমার জানা নেই।" লজ্জা পেলেন গোস্বামী। বুঝলেন মীরার দিব্যদৃষ্টি কতদূর এসে পৌঁছেছে।

ব্রজধামে কিছুকাল থাকার পর দ্বারকায় রণছোড়জীর শ্রীবিগ্রহের ভজন পূজনে জীবনের শেষ কয়টি বছর অতিবাহিত করবেন, এই ছিল তাঁর সংকল্প। তাই তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল দ্বারকার রণছোড়জীর মন্দিরে। ভাবাবেশে মীরা তখন পাগল হয়ে থাকতেন, আর গান গেয়ে চোখের জলে স্নান করিয়ে দিতেন তাঁর দেবতাকে।

ওদিকে মেবারের আকাশে দুর্যোগ এসেছিল ঘনিয়ে। মনে প্রাণে সবাই ভাবছেন মীরার কথা, মেবারের সৌভাগ্য বুঝি তাঁরই সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মীরাকে ফিরিয়ে আনাই স্থির হল, রাণা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদের পাঠালেন দ্বারকায়। কিন্তু মীরা তখন আর রাণার রাণী নন, পৃথিবীর সমস্ত মানুষ তখন তাঁকে দেবতা

ভাবছে। ব্রাহ্মণদের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে মীরা রণছোড়জীর অনুমতির জন্য মন্দিরে ঢুকলেন এবং বিগ্রহের সামনে গান ধরলেন—"সাজন, সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজেহো।" অর্থাৎ হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ বলে মনে জানো তবে তুমি আমাকে তুলে নাও। কৃপা করো, তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। হে মীরার প্রভু গিরিধারী, এই যে মিলন তোমার সঙ্গে, এতে আর বিচ্ছেদ ঘটিও না।'

গানের শেষে তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না মন্দিরের ভিতর থেকে। সবিস্ময়ে সবাই দেখল যে মীরাবাঈ নেই মন্দিরের মধ্যে, কিন্তু তাঁর পরিধেয় বস্ত্র আছে রণছোড়জীর দেহে। অলৌকিক অনুগ্রহে দেবতা গ্রহণ করেছেন তাঁর পরম ভক্তকে।

মীরাবাঈ-এর আর্তি আমাদের সকলেরই বুকে এসে বিঁধেছে,তাঁর চোখের জল আজও একই আকুতি নিয়ে আমাদের চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে যুগ যুগ ধরে।

মীরাবাঈ-এর আকুলতাই তাঁকে গিরিধারীর সান্নিধ্যে এনেছিল। তাই আমারা যদি তাঁর জন্য আকুল হই তিনি আমাদের বিরূপ করেন না। মীরাবাঈ-এর গান, আকুলতার মনের সেতারে অনুরণিত হয় তবে সেই অনুরণের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে আমরাও তাঁর মধ্যে বিলীন হতে পারব।

বিষ্ণুপ্রিয়া

সংসার জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহধর্মিণী হলেও আসলে তিনি ছিলেন শক্তিরূপা এবং শিষ্যা। পতি ছিলেন তাঁর জীবন সর্বস্ব, জীবন প্রভু, দয়িত। কিন্তু স্বামীর গৃহত্যাগের পর অন্তঃপুরের মধ্যে একান্তে তিনি শুরু করেন প্রেমভক্তির নিগূঢ় তপস্যা।

নিমাই এর বিবাহের পূর্বে বহুদিন ধরেই গঙ্গার ঘাটে দেখা হয় নিমাই জননী শচীদেবীর সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার। কখনও তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ দেখে মুগ্ধ হতেন, কখনও তার গুণপনায় মুগ্ধ হতেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরা, নম্রস্বভাবা ও সুলক্ষণযুক্তা। অপরূপ সুন্দরী বালিকা, স্থির বিদ্যুতের মতো ছিল তার সৌন্দর্য। দীর্ঘ পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ। অধর যেন হিঙ্গুল দিয়ে রাঙানো। নাম জিজ্ঞেস করাতে মধুর কণ্ঠে বালিকা উত্তর দেয়, বিষ্ণুপ্রিয়া। কিশোরী নবদ্বীপের সম্পন্ন গৃহী পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা। এই বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে মাতা শচীদেবীর মনে অনেক কল্পনার উদয় হয়।

মাতা শচীদেবীর ইচ্ছা বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি পুত্রবধূরূপে ঘরে আনেন। ঘটক কাশী মিশ্র মাতা শচীর অভিলাষ জানান সনাতন মিশ্রকে। নিমাই তখন বিদ্যায়, খ্যাতিতে, রূপে অদ্বিতীয়। এ হেন জামাতা পাওয়া আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতোই। সনাতন সানন্দে রাজী হন। রাজ আড়ম্বরে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বম্ভরের আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন বন্ধুরাই মহা ধুমধামে বিবাহের আয়োজন করে। আপ্যায়িত হন নবদ্বীপের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁদের পরিবেশন করা হয় মিষ্টি, গন্ধ, তাম্বুল ও মালা চন্দন। এই কন্দর্পকান্তি বিশ্বম্ভরকে মনোহর বরসাজে সাজিয়ে আনা হয় কন্যাপক্ষের গৃহে। চৈতন্য ভাগবত এই শোভাযাত্রার আনন্দোচ্ছ্বাসের বিবরণ দিয়েছেন—

দোলায় বসিল শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়
সর্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়।
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার
শুভ ধ্বনি বই কোন দিগে নাহি আর।
প্রথমে বিজয় কহিলেন গঙ্গাতীরে

পূর্ণচন্দ্র ধরিলেন শিরের উপরে।
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে।
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর
চলিল হইয়া দুই সারি পাটোয়ার
নানাবর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাচে
নর্তক না জানি কতেক সম্প্রদায়
পরম উল্লাসে দিব্য নিত্য করি যায়
জয় ঢাক, বীর ঢাক, মৃদঙ্গ কাহাল
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী করতাল
বরগোঁ শিঙ্গ, পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে যত
কি লিখিবে বাদ্যকাণ্ড বাজি যায় কত।।

ধনী সনাতন মিশ্রের একমাত্র কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া। রাজ আড়ম্বরে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দোলার মধ্যে নব বরবধূ দেখে মনে হয় যেন 'হরগৌরী' বা 'রামসীতা'। রাস্তার দুপাশে দর্শকরা পুলকিত হয়ে ওঠেন এই অনিন্দ্য সুন্দর কিশোর কিশোরীর যুগল মূর্তি দেখে।

রূপে আলো করা লক্ষ্মীস্বরূপিনী নববধূকে মাতা শচীদেবী কোলে করে নিজের গৃহে বরণ করে নিলেন। তাঁর নিজের অভাব আর ঘরের অভাব পূরণ হল। আজ তাঁর বড় আনন্দের দিন। দুঃখিনী শচীমাতা অনেক শোক-তাপের দিন পেরিয়ে এসেছেন, নিমাই আজ তাঁর মানুষ হয়েছে এবং পাণ্ডিত্যে সে তরুণ অধ্যাপকদের অগ্রগণ্য। অর্থ মান যশ সবই অর্জন করেছে নিমাই। শুধু তাই নয় সুলক্ষণযুক্তা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করে সে নিয়ে এসেছে। শচীমাতার চোখ মুখ আজ তাই আনন্দ হাসিতে প্রোজ্জ্বল।

আর কিশোরী নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়া? বিষ্ণুপ্রিয়ার কামনা সার্থক হয়েছে, নিমাইকে স্বামীরূপে লাভ করে। কন্দর্পের মতো রূপ নিমাইয়ের, বিদ্যার দীপ্তিতে আননখানি সদা ঝলমল করছে। এই অল্প বয়সে অধ্যাপনা বৃত্তির শীর্ষে আরোহণ করেছেন তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় তাই প্রেমে পুলকে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। অন্তর যখন তাঁর আনন্দে পরিপূর্ণ সেই সময়ে ছোট একটি ঘটনা তাঁর মনে গোপন আশঙ্কার ছায়ারূপে জেগে রইল। স্বামীর সঙ্গে বাসর ঘরে যেতে হঠাৎ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠে উচট লেগে রক্ত ঝরতে লাগল। স্বামী সেবায় রক্ত পড়া বন্ধ হল কিন্তু কেবলই মনে হতে লাগল — এ কি কোন অমঙ্গলের চিহ্ন?

কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া অনিন্দ্য সুন্দরী, রূপে, গুণে, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে সে

অতুলনীয়া। সনাতন মিশ্র তাঁর একমাত্র কন্যাকে রাজরাণীর মতোই গড়ে তুলেছেন। অধ্যাপক-রাজ বিশ্বম্ভরের সংসারটিতে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে রাজরাণীরই মতো। এই কিশোরী বধূর প্রেমের দুর্বার জোয়ারে বিশ্বম্ভর আজ ভেসে চলেছেন পরম আনন্দে।

বিশ্বম্ভরের সুগৌর কান্তি, বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্ব দেখে সবাই তাঁর প্রশস্তি করেন, কেউ বলেন এমন তেজ সাধারণ মানুষের সম্ভব না, এই তরুণ অধ্যাপকের জন্ম হয়তো বা বিষ্ণু অংশে। গঙ্গাতীরে শিষ্যগণ সহ যখন তিনি তাঁর বিদ্যাচক্রে উপবেশন করতেন, কেউ কেউ তাঁর মুখমণ্ডলের দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারতো না।

অধিক রাত্রে স্বামী তাঁর বিদ্যাচক্র থেকে গৃহে ফিরে বিষ্ণুপূজা এবং আহারের পর শয়নগৃহে যান, তখন তিনি একান্তে তাঁর সেবার অধিকার পেতেন এবং আনন্দে হয়ে উঠতেন উচ্ছল।

স্বামীর ক্ষুদ্র ও সচ্ছল সংসারটিতে আসার পর থেকে সে সুখ দিন দিন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শাশুড়ী দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা এবং পূতচরিত্রা। একমাত্র পুত্রের বধূ, রূপসী ও গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখেন তিনি নিজের কন্যার মতন। তাঁর স্নেহ ও সমাদরে বিষ্ণুপ্রিয়া অভিভূতা। প্রাণপ্রিয় পতি বিশ্বম্ভরের আদর সোহাগের তো অবধি নেই, তাঁর স্নেহ-প্রেমরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন। সবচাইতে বড় কথা, তিনি অসামান্য প্রেমিক ও রসিক পুরুষ, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর অনুরাগের তুলনা নেই।

স্বামী সোহাগিনী তরুণী বিষ্ণুপ্রিয়ার এ অনন্য সুখ সৌভাগ্য কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। জীবন সর্বস্ব স্বামীকে চিরতরে হারান বিষ্ণুপ্রিয়া। চরম দুঃখ দহনের মধ্য দিয়ে, তীব্র জ্বালার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের এক নূতনতর অধ্যায়। সে অধ্যায় আত্মিক সাধনার সিদ্ধিতে ভরপুর। ইষ্ট পতি ও দয়িতের পরম প্রাপ্তির আলোয় তা সমুজ্জ্বল।

গয়ায় পিতার পারলৌকিক কর্ম করার সময় নিমাই বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন ও স্পর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এর ফলে তাঁর জীবনে আসে এক আমূল পরিবর্তন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে আপ্লুত বিশ্বম্ভরের দুই নয়নে পুলকাশ্রু ধারা অঝোরে ঝরতে থাকে। মুহূর্তের পাদ-পদ্ম দর্শন আকুল করে তোলে বিশ্বম্ভরকে। বিমোহিত বিশ্বম্ভরের উন্মত্ত-আর্তনাদ "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় আমার কৃষ্ণ" অনুরণিত হতে থাকে আকাশে, বাতাসে।

'কোথা কৃষ্ণ! কোতা কৃষ্ণ! বলে অনুক্ষণ।
কখনো কখনো যে বা হুঙ্কার করয়ে।।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়ে।

রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে।।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে পড়ে বৈসে।

(চৈঃ—ভাঃ ২/১)

বিষ্ণুপ্রিয়া আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন তাঁর স্বামীর। তবে কি এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা? প্রিয় সখা গদাধর তাঁকে আশ্বাস দেন যে "কৃষ্ণ ত তোমার হৃদয়েই রয়েছেন বিরাজিত।" বিশ্বম্ভরের এই তীব্র প্রেমার্তি, কৃষ্ণ বিরহের এই দহন জ্বালা অতঃপর ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, এবার কৃষ্ণ মিলনে আনন্দাবেশে অধীর হয়ে পড়েন, নটবর কৃষ্ণের লীলাময় ভঙ্গিমার অনুকরণ করেন। এখন আর তাঁর উদ্দামতা ও উন্মত্ততা নেই, আছে সুমধুর ভাববিলাস।

নটবর কৃষ্ণের মোহন বেশে স্বামীকে সানন্দে নিজ হস্তে তিনি সাজিয়ে দেন, ভাববিহ্বল হৃদয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকেন তাঁর দিকে, স্বর্গীয় আনন্দে দেহ-মন প্রাণ স্পন্দিত হতে থাকে। কৃষ্ণ ভাবে সদা বিভাবিত বিশ্বম্ভরের এ সময়কার রূপ সজ্জা সম্পর্কে বাসু ঘোষ যা লিখেছেন—

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে
বেড়িয়াছে মালতীর মালে।
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুলশাখা।
কসিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ
কটি মাঝে বসন সুরঙ্গ।
চন্দন তিলক শোভে ভালে
আজানুলম্বিত বনমালে।
নটবর বেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ।
তা দেখিয়া বাসু ঘোষ কাঁদে
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে।

(ভক্তিরত্নাকর)

এই পর্যায়ের পর শুরু বিশ্বম্ভরের ঐশ্বর্য প্রকাশ। শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য গৃহেও তিনি ঐশ্বরীয় ভাব প্রকাশ করেন।

বিশ্বম্ভর এবং নিত্যানন্দ যখন খেতে বসেছেন জননী শচীদেবী প্রগাঢ় অপত্য স্নেহে খাদ্য পরিবেশন করতে করতে তিনি দেখতে পান এক অপূর্ব দ্যুতি। এই দ্যুতি ভরিয়ে দিল শচীমাতার মন ও প্রাণ।

শচীমাতার মুখে এদিনকার দিব্যদর্শনের সব কথা শ্রবণ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি বলেন, "বৌমা নিমাইয়ের ঐ দিব্যমূর্তির বুকে আমি যে তোমার আলোয় ভরা

মুখখানি দেখলাম।" স্বামীর দিব্য জীবনের, অলৌকিক জীবনের সত্যতা সেদিন দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়ে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরপটে। সেই সঙ্গে স্বামীর সহধর্মিণীরূপে তাঁর নিজের একটা দৈবী ভূমিকা রয়েছে, সে তত্ত্বটিও উপলব্ধি করেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

শ্রীবাস অঙ্গনে নাম কীর্তন করতে করতে বিশ্বম্ভর হয়ে যান ভাবাবেশে উন্মত্ত। কীর্তনের পর গৃহে ফিরেও বিশ্বম্ভরের এই ভাব বিহ্বলতা কাটতে কিছু সময় লাগে। স্বামীর এই ভাবোন্মত্ত অবস্থায় বিষ্ণুপ্রিয়া তখন আর প্রেমময়ী স্ত্রীর ভূমিকায় থাকেন না, থাকেন নিবেদিত প্রাণ এক মমতাময়ী শিষ্যা। দূরে দূরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে সযত্নে লক্ষ্য রাখেন তাঁর সিদ্ধ-পুরুষ প্রাণের দেবতার দিকে। ভাবাবেশ কেটে গেলে বিশ্বম্ভর যখন বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হন তখন পতিব্রতা প্রেমময়ী স্ত্রীকে প্রেমভরে তিনি বুকে টেনে নেন, তখন এক স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই বিশ্বম্ভরের দুইটি রূপ, কখনও তিনি ব্রজের লীলাময় দিব্যপুরুষ বা কখনও এই মাটির পৃথিবীর সোঁদা গন্ধে ভরা প্রেম দয়া মায়াময় রক্তমাংসের মানুষ, তাই তো তাঁকে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিস্ময় আনন্দ ও বিষাদের অবধি নেই।

কৃষ্ণপ্রেমে পাগল বিশ্বম্ভর সংসারের মায়াবন্ধন থেকে চান মুক্তি, তাই তিনি পা বাড়াতে চান সন্ন্যাস জীবনের পরিক্রমায়। কিন্তু এই সন্ন্যাস গ্রহণ বিশ্বম্ভরের কাছে যতই আকর্ষণীয়, অপরিহার্য এবং আনন্দের হোক না কেন মাতা শচীদেবী ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে দুশ্চিন্তা আর বিষাদের বস্তু।

গভীর রাত্রে শ্রীবাস অঙ্গনের নামকীর্তনের পর বিশ্বম্ভর গৃহে প্রবেশ করতে বিষাদময়ী বিষ্ণুপ্রিয়া চোখের জলে ভরিয়ে দেয় স্বামী বিশ্বম্ভরের পদযুগল এবং অনুনয়ের স্বরে আর্তি জানায় প্রাণপ্রিয় স্বামীর কাছে—'আমি জানি আমি তোমার পথের বাধা তবুও হে দেবতা। তুমি আমার প্রতি পাষাণ হৃদয় হয়ো না, তুমি তো দয়ার ঠাকুর। সারা বিশ্বের পাপী-তাপীদের বিলোচ্ছ প্রেম, দিচ্ছ অনুকম্পা আর দয়া। ওগো প্রাণপ্রিয়, এই অভাগীর মুখের দিকে চেয়ে একটু দয়া করতে পার না, তুমি সংসারে যেমন আছো তেমনি থাকো, তোমার সাধনভজন নর্তনে আমি কোন বাধাই হব না, শুধু তুমি আমার চোখের সামনে থাকবে। আমি তোমায় চোখ দিয়ে দেখব আর অন্তর দিয়ে পুজো করব। সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে আমাকে পথের ধূলায় ফেলে রেখে যেও না। আর তাই যদি করতেই চাও তাহলে আমি নিজেই চলে যাবো পৃথিবী থেকে। কারণ হে প্রিয়তম! তুমি বৃক্ষ আর আমি লতা, তুমি শাখা আমি পুষ্প, তুমি শ্যামল দুর্বা আমি তার উপর ভোরের শিশির বিন্দু তাই তুমি ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই।" এই কথা বলতে বলতে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে প্রায় সংজ্ঞাহীনা হয়ে পড়ে বিহ্বলা বিষ্ণুপ্রিয়া।

পরম আদরে পত্নীকে কাছে টেনে নেন বলেন, “তুমি আমার পথের বাধা নও বিষ্ণুপ্রিয়া। ও কথা বলে আমার মনে কষ্ট দিও না। আমি আজ কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। আমার কৃষ্ণের পথ রাজপথ, সবাই সেই পথ দিয়ে যেতে পারে, লাভ করতে পারে তাঁকে। তাই আমি চাইছি তুমিও আমার মতো কৃষ্ণভজনে মত্ত হও, কৃষ্ণ কৃপার জন্য সদা উন্মুখ হয়ে থাকো। নাম তোমার বিষ্ণুপ্রিয়া, সত্যকার প্রিয়া হয়ে ওঠো তুমি, বিষ্ণুর মিলন পথে, কৃষ্ণের মিলন পথে, তুমি এগিয়ে এসো, সে পথে তোমার আমার ভেতরে এতটুকু বিচ্ছেদ থাকবে না। এসো কৃষ্ণসত্তায় পৌঁছে আমরা দুজনেই নিবিড়তর মিলনসুখ সম্ভোগ করি”। এইভাবে প্রিয়তমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বাষ্পাকারে উড়িয়ে দিলেন তার মনের সমস্ত শোক ও শঙ্কা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলেন—“আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে আজ রাতে, তোমায় মনের মতো করে সাজাই, প্রাণভয়ের তোমার দেবদুর্লভ রূপ দেখি। সম্মতি পেয়ে স্বামীর প্রশস্ত ললাটে অজস্র চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। নতুন করে কাজল পরিয়ে রেখা এঁকে দেন তাঁর আয়ত নয়ন দুটিতে। কণ্ঠে তাঁর দুলিয়ে দেন স্বহস্তে গাঁথা মালতীর শুভ্রমালিকা।

বিশ্বম্ভরের চোখে মুখে অপূর্ব আনন্দের দীপ্তি। তিনিও দক্ষ সজ্জাকারের মতো সাজিয়ে তোলেন তাঁর প্রিয়াকে। চন্দন কুমকুম আর কজ্জলের রেখায় রেখায় প্রোজ্জ্বল করে তোলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখকান্তি। উভয় উভয়কে এইভাবে সাজিয়ে একে অপরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকেন। পরিবেশ হয়ে ওঠে মোহময় ও কুহুকিনী। বিহ্বল হয়ে যান উভয়েই পরস্পর আবদ্ধ হন প্রেমবন্ধনে। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

অবশেষে এল শুক্লপক্ষের সেই রজনী, মাতার স্নেহনীড়, প্রেয়সীর প্রেমবন্ধন ছিন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকুল আহ্বানে বিশ্বম্ভর করলেন গৃহত্যাগ। আকাশের চাঁদ তখনও অস্তমিত হয়নি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোয় বিশ্বচরাচর প্লাবিত। কিন্তু শচীমাতার ঘরের কোণের চাঁদের টুকরো কোথায়? আকুল শচীমাতার বুকভাঙা ক্রন্দনে জেগে ওঠেন অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। কোথায় তাঁর প্রিয় দয়িত, কোথায় তাঁর প্রেমাস্পদ? শূন্য শয্যা তাঁর দাম্পত্য জীবনের সকল সুখের স্মৃতি হয়ে রইল। এইভাবে দৈবের বিধান নির্মম করে মুছে দিয়ে গেল তাঁর দাম্পত্য-জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা।

এই শেষ রাতে শুক্লপক্ষের আলোয় ভরা আকাশের নীচে ভক্তেরা একে একে জড়ো হলেন মাতা শচীদেবীর আঙিনায় এবং শোক-সন্তপ্ত চিত্তে ঘিরে রইলেন সংবিদহারা মাতা শচীদেবী আর বধূ বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

এই শোক দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এক তরুণ ভক্ত, নাম তাঁর বংশীবদন। ভক্ত বংশীবদনের লেখনী দিয়ে বেরিয়ে আসে যে ছন্দময় কথাগুলি কাব্যের আকারে তা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি মর্মচ্ছেদী। বংশীবদনের সেই বাণীগুলি যেন

করুণ বংশীর সুরের মত আজও বারে বারে আমাদের কর্ণকুহরের মধ্য দিয়ে মর্মের অন্তস্থলে ঝঙ্কার তোলে—

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক কাচ
আর না হেরিব সোনার কমলে
নয়ন খঞ্জন নাচ
আর না নাচিবে শ্রীবাস মন্দিরে
ভকত চাতক লৈয়া
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আমরা দেখিব চায়্যা
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন এক ঠাঞি
নিমাই করিয়া ফুকারি সবাই
নিমাই কোথায় নাই
নির্দয়ে কেশবে ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়ার মাঝ
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরচাঁদ
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়গড়ি যায়।।

(পদ কল্পতরু)

নিত্যানন্দ বৃন্দাবনের পথ থেকে প্রভুকে ভুলিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন শান্তিপুরে। সেখানে প্রভুর আজ্ঞা নিয়ে নিত্যানন্দ মাতা শচীদেবীকে আনয়নের জন্য উপস্থিত হলেন নবদ্বীপে।

অঙ্গনে শিবিকা এসে উপস্থিত হয়েছে। তখন মাতা শচীদেবী এবং বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েই তৈরি হয়ে এসে সামনে দাঁড়ান। বিরহ কাতরা, সরলা বালিকাবধূ স্বামীকে দর্শনের জন্য আকুল হয়েছেন। তাঁর হৃদয় দেবতাকে দর্শনের জন্য লক্ষ লক্ষ নর-নারী ব্যাকুল হয়ে ছুটছে, তিনিই বা যাবেন না কেন! সমবেত নারীপুরুষ এই শোক কাতরা লক্ষ্মী প্রতিমার ব্যথায় অন্তরে ব্যথা অনুভব করে। নিত্যানন্দের বুকের ভিতরে ব্যথা গুমরে গুমরে উঠতে থাকে। রামায়ণে লক্ষ্মণকে যেমন সীতার বনবাসের নির্মম আদেশ শোনাতে হয়েছিল, নিমাইয়ের পত্নী বিসর্জনের কঠোর

আদেশ নিত্যানন্দকে জানাতে হবে। তাই নিত্যানন্দকে নিষ্ঠুরের মত বলতে হয় 'শ্রীমতীর যাবার নির্দেশ নেই'।

নীরবে বজ্রপাত হয়। সবাই তখন হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়া হয়েছেন সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো। শচীমাতার আঁচল ছেড়ে দিয়ে যেমন ধীর পদক্ষেপে তিনি এসেছিলেন, তেমনি ধীরপদে নিজের ঘরে ফিরে যান। স্থির বিদ্যুতের মতো সুশ্রী পদযুগল, তাতে রৌপ্য মলগুচ্ছ প্রতি পদক্ষেপে রিনিঝিনি বাজে। এই মধুর শিঞ্জিনী শব্দ বুকফাটা নীরব আর্তনাদের সঙ্গে মিশে দর্শকগণকে ব্যথায় অভিভূত করে।

অবশেষে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেই মাতা শচীদেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্তিপুরে যেতে রাজী করান। তাঁর দুঃখ তিনি একাই বহন করবেন। তাঁর দুঃখ অনন্য সাধারণ। তিনি স্থূল চক্ষুতে দেখতে না পেলেও গৌরাঙ্গ তাঁর অন্তরে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

ভোগের পথ চিরতরে ত্যাগ করে সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্র ময় পথটি বেছে নিয়েছেন স্বামী। তাই সেই ভোগের পথ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া সরে এলেন, গ্রহণ করলেন কঠোর বৈরাগ্য আর তপস্যাময় জীবন।

গৃহত্যাগ করার পূর্বে একদিন ক্রন্দনরতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধিত করেছিলেন শ্রীচৈতন্য "আমি আশীর্বাদ করি, কৃষ্ণ আরাধনায় তুমি প্রাণ মন-তন ঢেলে দাও, কৃষ্ণলাভ কর। কৃষ্ণের ভিতরেই তুমি আমাকে পাবে।" এই আশ্বাসবাণী সত্য হয়েছিল, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন তপস্যা ভরে উঠেছিল সার্থকতায় ও পরম প্রাপ্তিতে।

স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী ইষ্টরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন পরম প্রভু কৃষ্ণকে। স্বামীর প্রতিটি কথা জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরপটে। একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমি যেমন কৃষ্ণের ভজন করছি, কৃষ্ণরসে মজে আছি, তুমিও তেমনি কর। কৃষ্ণসত্তার ভিতর দিয়েই ঘটবে আমাদের মিলন, আর সে মিলন হবে ছেদহীন অন্তহীন"।

তাই নিত্যকার কর্ম, কৃচ্ছ্র সাধন, ধ্যান জপে বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর সেই বাণীকে অনুসরণ করে চলেছেন কান্নাময় বিরহপথ দিয়ে চিরমিলনের কেন্দ্রবিন্দুটি লক্ষ্য করে। সেইজন্য তাঁর সাধনজীবনে পরম পাওয়া পেয়ে, পরম প্রভুকে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন মহাবৈষ্ণবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

দেবী তুলসী

দেবী ভাগবতে দেবর্ষি নারদ তুলসী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে নারায়ণকে বললেন, "হে প্রভু! অধমের অহেতুক অনুসন্ধিৎসার জন্য যদি মার্জনা করেন তবে বলি, এই তপস্বিনী তুলসী পূর্ব জন্মে কে ছিলেন? মানব জন্মই বা কেন গ্রহণ করলেন? আর কি রূপেই বা দেবী হয়ে বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন?"

ভক্ত নারদের প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ তুলসীর ইতিকথা শুরু করে বললেন যে, সেদিন ছিল কার্তিকী পূর্ণিমা, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় বিশ্বচরাচর করছে ঝলমল, এই সময়ে রাজা ধর্ম্মধ্বজের ঘরে জন্ম নিলেন লক্ষ্মীর অংশে চাঁদের মতো টুকটুকে এক কন্যা। অতুলনীয়া হওয়ার জন্যই এর নামকরণ হল তুলসী।

যৌবন সমাগমে তুলসী বদরী তপোবনে তপস্যা করতে গেলেন। যৌবনবতী তুলসীর তপস্যাকালে একমাত্র কামনা ছিল স্বয়ং নারায়ণই তার স্বামী হোন। কারণ তুলসীর আবাল্যের স্বপ্ন সফল করার জন্য বদরিকাশ্রমে তিনি বছরের পর বছর গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান এবং বর্ষাকালে আসনস্থ হয়ে নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহ্য করে তপস্যা করতে লাগলেন এবং সেই তপস্বিনী তপস্যাকালে ফল, গলিত পত্র, বায়ু আবার কখনও অনাহারে তপস্যা করতে থাকেন।

তুলসীকে এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে দীর্ঘকাল তপস্যা করতে দেখে তপোমুগ্ধ ব্রহ্মা তাঁর সমীপে এসে তাঁকে বর দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন,

বরং বৃণীষ্ব তুলসি যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যমজরামরতামপি।।

(দেবী ভাগবত, ৯/১৭/২০)

অর্থাৎ তুলসী, তুমি বর প্রার্থনা কর, হরিভক্তি, হরির দাস্য অথবা অজরামরতা এর মধ্যে যে কোন একটি বর প্রার্থনা কর।

ব্রহ্মার কথা শুনে তুলসী যৎপরোনাস্তি খুশী হয়ে বললেন, "হে পিতামহ, পূর্বে আমি গোলকের গোপিকা ছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের সেবিকা হয়ে সর্বদা তাঁর সেবা করতাম। আমি ছিলাম শ্রীরাধার অংশোদ্ভূতা এবং প্রিয়তমা সখী। একদা রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণসহ কৌতুক ও রসালাপের সময় আবেগ তাড়িতা হয়ে সংজ্ঞাহীন

হই। সেই সময় রাসেশ্বরী রাধিকা হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে আমাকে সেই অবস্থায় দেখে তাঁর মনে সন্দেহের বাষ্প ঘনীভূত হল। আমার দুর্ভাগ্য এখানেই শেষ নয়। জ্ঞান ফিরতে সম্মুখে দেখি স্বয়ং শ্রীরাধিকা। হে জগৎ বিধাতা! আমাকে সেই মুহূর্তে ক্রোধান্বিতা শ্রীরাধিকা অভিশাপ দিলেন—'পাপিষ্ঠে! তুই মর্ত্যলোকে মানবী রূপে জন্ম গ্রহণ কর।' তাঁরই অভিশাপে আমি আজ মর্ত্যবাসিনী। কিন্তু শ্রীরাধিকার এই রূপ শাপ প্রদানকালে গোবিন্দ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যদিও রাধার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না। তবে মর্ত্যধামেই তুমি আমাকে পতিরূপে অবশ্যই পাবে।' হে গুরুদেব, আপনি যদি আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আপনি এই বর দিন যাতে আমি সেই কমনীয়রূপ সুন্দর এবং শান্ত নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করতে পারি—

"অহং নারায়ণং কান্তং শান্তং সুন্দর বিগ্রহম্।
সাম্প্রতং তং পতিং লব্ধুং বরয়ে ত্বঞ্চ দেহিমে'।।"

উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ ও রাধারাণীর অভিশাপগ্রস্ত সুদামা নামে এক গোপ দৈত্যবংশে শৌর্যশালী পুরুষ শঙ্খচূড় নামে জন্মগ্রহণ করেছে। পূর্বকালে এই সুদামা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল কিন্তু শ্রীরাধিকার ভয়ে তোমার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। হে কল্যাণী, তুমি জাতিস্মরা, এই ঘটনার সত্যাসত্য জানতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। এখন তুমি তাকেই পতিরূপে গ্রহণ কর এবং পরে নারায়ণকে পাবে।"

দৈত্যবংশোদ্ভুত শঙ্খচূড় তপস্যায় বর প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মার আদেশক্রমে বদরিকাশ্রমে গমন করলেন। আশ্রম প্রান্তরে তুলসী দেবদ্যুতি সম্পন্ন পুরুষটিকে দর্শন করলেন। কন্দর্পকান্তি এই পুরুষের রূপ মেঘহীন আকাশে পূর্ণদ্যুতিতে বিদ্যমান পূর্ণিমার শশীকলার স্নিগ্ধ রূপের সঙ্গেই তুলনীয়। সুন্দর সুঠাম যুবা পুরুষটির উন্মুখ বাহুযুগল বিভিন্ন মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। তাঁব প্রশস্ত বক্ষদেশে বিরাজমান বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য রত্নখচিত বিভিন্ন অলঙ্কারাদি। অক্ষিদ্বয়, প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো এবং গাত্রবর্ণ স্বর্ণচাঁপাকেও হার মানায়।

তুলসী মনোমুগ্ধকর যুবা পুরুষটিকে দেখে লজ্জায় আরক্ত বদনে নতমুখ হলেন। শঙ্খচূড় ধীর পদক্ষেপে তুলসীর সন্নিকটবর্তী হয়ে সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করলেন, "হে অনিন্দ্য সুন্দরী! আমি কি তোমার পরিচয় জানতে পারি?"

ব্রীড়ানম্রমুখে তুলসী নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্ঞানী। তাই এই নির্জন স্থানে অপরিচিতা কুলকামিনীর সঙ্গে বাক্যালাপের প্রচেষ্টা বা পরিচয় জিজ্ঞাসা করার মতো শাস্ত্র গর্হিত কাজ আপনার পক্ষে সাজে না।"

তুলসীর এই প্রশ্নটি শঙ্খচূড়কে আহত না করে আনন্দিতই করেছিল। এবং

তুলসীর প্রতি শঙ্খচূড়ের আগ্রহ অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর শঙ্খচূড় নিজ পরিচয় দিয়ে বললেন যে, ব্রহ্মার আদেশেই তিনি তুলসীকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করে তুলসীর মতো স্ত্রীধনে গর্বিত হতে চান। তুলসীর মনে তখনই ব্রহ্মার উপদেশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর তা ক্রমে বিবাহের সম্মতি প্রকাশে মুখ মণ্ডল হল রক্তিমাময়।

বিবাহের পর পরম বিক্রমশালী শঙ্খচূড় ও তুলসী পরম আনন্দে কালাতিপাত শুরু করেন। বিহার ও রতিক্রিয়াপূর্ণ আনন্দঘন মুহূর্তগুলি এই নব দম্পতিকে সম্পূর্ণভাবে উন্মত্ত করে রেখেছিল। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে প্রমোদ ভ্রমণের পর পুনরায় বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে শঙ্খচূড় রাজ্য স্থাপন করে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করলেন।

রাজ্য বিস্তারে অদমনীয় আকাঙক্ষা নিয়ে শঙ্খচূড় রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে দেবলোকে হাজির হলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত এই শঙ্খচূড়ের আক্রমণে দেবতারা রাজ্যহারা হলেন। রাজ্যহারা, সম্পদহারা দেবগণ নিরুপায় হয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন।

ভগবান ব্রহ্মা সমস্ত ঘটনা শুনে দেবগণসহ কৈলাসপতি শিবের নিকট গমন করলেন। এই সেই শিব, যাঁর রুদ্রনৃত্য, ত্রিশূলের ঝলকানি ও ডমরুর মহানিনাদ পৃথিবীকে বারে বারে রক্ষা করেছে অত্যাচারী নিধন করে। কিন্তু শঙ্খচূড়ের প্রশ্নে সেই শিবও হলেন নীরব। তাই তিনি ব্রহ্মাসহ সমস্ত দেবতাগণকে নিয়ে উপস্থিত হলেন বিষ্ণুলোকে, সমস্ত সৃষ্টির পালক বিষ্ণুর কাছে।

শ্রীবিষ্ণু বললেন যে, তিনি দুর্দান্ত প্রতাপ শঙ্খচূড় ও দেবতাদের দুর্দশার কথা সবই অবগত আছেন। এবং তিনি নিজেই ইতিপূর্বে শঙ্খচূড়ের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে একটি রক্ষা কবচ দিয়েছেন, যার ফলে শঙ্খচূড় অজেয়। এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে বিরস বদনে শ্রীবিষ্ণুর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সর্ব সঙ্কটমোচনকারী শ্রীবিষ্ণু দেবতাদের অভয় দিয়ে বললেন যে, শঙ্খচূড়ের শাপমুক্ত হবার সময় হয়েছে এবং তিনি নিজেই শঙ্খচূড় দমনের ব্যবস্থা করবেন।

শ্রীবিষ্ণু তখন মহাদেবকে অভয় ত্রিশূল দিয়ে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে রক্ষাকবচটি ভিক্ষা চেয়ে নিয়ে শঙ্খচূড়কে অরক্ষিত ও হীনবীর্য করলেন। কিন্তু মহাদেবও প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করেও শঙ্খচূড়কে নিপাত করতে পারলেন না। দেবতারা প্রমাদ গুণলেন যে, শঙ্খচূড়ের সংহার না হলে তাঁদের মুক্তি নেই।

ইতিপূর্বে শঙ্খচূড়ের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শঙ্খচূড়ের প্রার্থনা মতো অমরত্ব বর দানে অক্ষমতা জানিয়ে ব্রহ্মা শঙ্খচূড়কে শর্তসাপেক্ষ অমরত্ব দান করেন। সেটি

হলো শঙ্খচূড়ের পত্নীর সতীত্ব নাশ না হলে শঙ্খচূড়ের মৃত্যু নেই। অতএব শঙ্খচূড় বিনাশের জন্য শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং শঙ্খচূড় পত্নী তুলসীর সতীত্ব নাশের ভার নিলেন।

দানবরাজ শঙ্খচূড় যখন দেবতাদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন শ্রীবিষ্ণু তাঁর রূপ ধরে রাজ অন্তঃপুরে তুলসীর শয়নকক্ষে হাজির হলেন। রাণী তুলসী পরম প্রিয় স্বামীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখে পরম আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তুলসীর এখন আর আনন্দের সীমা নেই। রণক্ষেত্র থেকে স্বামী স্বয়ং শিবকে যুদ্ধে পরাস্ত করে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

উৎফুল্ল তুলসী স্বামীকে নিজ হস্তে সুবাসিত জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালন করলেন। অতঃপর নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তা পরিপাটিভাবে মুছিয়ে কাছে বসে স্বামীকে রণবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "হে স্বামী, তুমি কি রূপে দেবাদিদেব মহাদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করলে তা আমাকে বল?"

শঙ্খচূড়রূপী হরি তুলসীর প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা কথা বললেন,—

আবয়োঃ সমরঃ কান্তে পূর্ণমব্দং বভূব হ।
নাশো বভূব সর্ব্বোষাং দানবানাঞ্চ কামিনি।।
প্রীতিঞ্চ কারয়ামাস ব্রহ্মা চ স্বয়মাবয়োঃ।
দেবানামাধিকারশ্চ প্রদত্তো ব্রহ্মণাজ্ঞয়া।।
ময়াগতং স্বভবনং শিবলোকং শিব গতঃ।

(দেবী ভাগবত, ৯/২৪/১৪-১৬)

অর্থাৎ হে কামিনী! পূর্ণ এক বছর ধরে আমাদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সমস্ত দানবসৈন্যগণ ধ্বংস হয়েছে। স্বয়ং ব্রহ্মা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মহাদেব এবং আমার মধ্যে সম্প্রীতিস্থাপন করে যুদ্ধের অবসান ঘটালেন। পরে তাঁরই আদেশে দেবগণের রাজ্যাধিকার ফিরিয়ে দিয়ে আমি স্বভবনে উপস্থিত হয়েছি, মহাদেবও শিবলোকে গমন করেছেন।" এই বলে হরি পালঙ্কে শয়ন করলেন এবং তুলসীকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু রমণকালে সাধ্বী তুলসীর কাছে তাঁর প্রিয়স্বামী শঙ্খচূড়ের চির পরিচিত সোহাগ ও রমণকলার মধ্যে কিছু বিসদৃশ অনুভূত হয়। তাই তুলসী ছদ্মবেশী গোপীনাথের প্রকৃত পরিচয় জানতে চান। মায়াবলে তাঁকে উপভোগ করে তাঁর সতীত্ব নাশ করাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হলেন। তিনি তো এভাবে তাঁকে লাভ করতে চাননি। তাই অভিমানিনী তুলসী ক্রোধবশতঃ অভিসম্পাত করতে উদ্যত হলে গোপীনাথ শাপ ভয়ে সুমনোহর স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তখন দেবী তুলসী দেখলেন তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান তাঁরই পূর্ব জন্মের প্রেমাস্পদ নবজলধর শ্যামসুন্দর স্বয়ং। দেবী ভাগবতের ভাষায়—

নবীন নীরদশ্যামং শরৎ পঙ্কজলোচনম্।
কোটিকন্দর্পলীলাভং রত্নভূষণভূষিতম্।

ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং শোভিতং পীতবাসসম্।।

(দেবী ভাগবত, ৯/২৪/২০/২১)

অর্থাৎ তাঁর নয়নদ্বয় শরৎকালের শিশিরসিক্ত বিকশিত পদ্মের পাপড়ির মতো। সর্বাঙ্গ মণিমানিক্যখচিত আভরণে ভূষিত এবং পীত বসনে শোভিত। তাঁর রূপ লাবণ্য কোটি কন্দর্পের তুল্য।

তুলসী গোপীনাথকে দর্শন করে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন। পরে চেতনা লাভ করে গোপীনাথকে বললেন,—

হে নাথ তে দয়া নাস্তি পাষাণসদৃশস্য চ।
ছলেন ধর্ম্মভঙ্গেন মম স্বামী ত্বয়া হতঃ।।
পাষাণ হৃদয়স্ত্বং হি দয়াহীনো যতঃ প্রভো।।
তস্মাৎ পাষাণরূপস্ত্বং ভবে দেব ভবাধুনা।
যে বদন্তি চ সাধুং ত্বাং তে ভ্রান্ত হি ন সংশয়ঃ।।

(দেবী ভাগবত, ৯/২৪/২৩-২৫)

অর্থাৎ হে নাথ! তোমার দয়া নেই, তোমার হৃদয় পাষাণতুল্য। তুমি ছলনার দ্বারা আমার ধর্ম নাশ করে আমার স্বামীকে নিহত করলে। হে প্রভো, যে হেতু তুমি পাষাণের মতো দয়াহীন, সেই কারণে দেব, এখন থেকে তুমি সংসার মধ্যে পাষাণ মূর্তি হবে। যাঁরা তোমাকে করুণাসিন্ধু বলে থাকেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভুল করেন।

আকুল ক্রন্দনরত অবস্থায় মহাসাধ্বী তুসলী ছলনাময়ের পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে বারংবার বিলাপ করতে লাগলেন। তখন করুণাসাগর গোলোকপতি গোপীনাথ তুলসীকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "হে সাধ্বী, শঙ্খচূড় তোমার জন্য বহুকাল তপস্যা করেছে তার ফলে তোমাকে পত্নীরূপে লাভ করে বহুদিন বিহার করেছে। আমার জন্যও তুমি দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলে। এখন আমারও তোমাকে তপস্যার ফল দান করা কর্তব্য। হে আমার প্রেমাস্পদা প্রিয় ভক্ত, তুমি তো আমাকে পাবে, শুধু পাবে বললে পূর্ণ বলা হল না, তুমি পাবে আমার মন, দেহ ও যৌবন। আমার সঙ্গে তোমার বিহার পূর্ণতা লাভ করার পর তোমার দেহ বেগবতী পুণ্য সলিলা গণ্ডকী নদী নামে মর্ত্যধামে প্রবাহিত হয়ে মর্ত্যবাসীদের তোমার পুণ্য সলিলে অবগাহন করার সুযোগ দিয়ে তাদের ধন্য করবে। আর তোমার ঐ রেশম কালো কেশদাম নধর ও পবিত্র তুলসীগুল্মরূপে ধরিত্রীর বুকে শোভা পাবে। হে বরাননে, এই ত্রিভুবনে তুলসী-ই হবে পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার। দেবপূজায় অন্যান্য পুষ্প এবং পত্রের মধ্যে তুলসী পত্র হবে প্রধান অর্ঘ্য। তাই তুলসীবৃক্ষ সমগ্র ত্রিলোকে হবে বন্দনীয়।"

এরপর সাধ্বী তুলসীর অভিশাপ মাথায় তুলে নিয়ে ভগবান হরি বললেন- 'আমি গণ্ডকী নদীর তীরে শত সহস্র প্রস্তর খণ্ড রূপে অবস্থান করব। এই

শিলাখণ্ডে তীক্ষ্ণ দন্তময় কীট আমার চক্র রচনা করবে। এই শিলা খণ্ডগুলির নাম হবে 'শালগ্রাম শিলাখণ্ড'। মর্ত্যের মানুষ তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে তারই পাদমূলে এই শালগ্রাম শিলাকে প্রতিষ্ঠা করবে। হে সাধ্বী, এরপর থেকে আমি তোমার পাদমূলে থাকব শালগ্রাম শিলারূপে।"

ভগবান হরি এরূপ বলার পর নীরব হলে তুলসী মানবদেহ ত্যাগ করলেন। দিব্য রূপধারিণী দেবী তুলসী গোলোকধামে যাত্রা করলেন। এবং স্বয়ং গোপীনাথই হলেন তাঁর পথ প্রর্দশক।

বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে তুলসীকে জানলে শ্রী বিষ্ণুকেও জানা যায়। বিষ্ণুকে আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু তুলসীবৃক্ষকে আমরা চোখে দেখতে পাই। তাই তুলসী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করলে শ্রী বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করা হয়।

প্রতিটি হিন্দুর গৃহে একটি করে তুলসী মঞ্চ থাকে। যাঁর বাড়িতে স্থানাভাব তিনিও সযত্নে টবেতেও তুলসীবৃক্ষ স্থাপন করেন। এবং প্রতিটি তুলসী বৃক্ষের পাদমূলে একটি করে নারায়ণ শিলা রাখা হয়। সন্ধ্যা সমাগমে হিন্দু গৃহিণী ভক্তিনম্র চিত্তে গলবস্ত্র হয়ে তুলসীর পাদদেশে একটি প্রদীপ রেখে শঙ্খধ্বনি সহকারে তুলসীর বন্দনা ও সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। তাই আজ বনের তুলসী ঘরের কোণে এসে দেবী মাহাত্ম্যে সংসারের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এটা বিশ্বাস ও ভক্তির কথা। কিন্তু যুক্তিবাদীদের কাছে আমার প্রশ্ন ভক্তিবাদকে দূরে রেখে আমরা যদি তুলসীর গৃহস্থ জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা একটু ভাবি তবে প্রকৃত তথ্যটি উদঘাটিত হয়ে ওঠে।

তুলসী একটি ওষধিবৃক্ষ। এই বৃক্ষের প্রতিটি অংশ থেকেই আমরা বিভিন্ন রোগের কিছু না কিছু ঔষধ পাই। পুরাকালের মুনি ঋষিরা একথা জানতেন। তাই তুলসী বৃক্ষকে বন থেকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছেন গৃহের আঙিনায়।

তৎকালীন ধর্ম ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের আবরণের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। বৈশাখ মাসের দারুণ তাপে তুলসীগাছকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে জলের ঝারা দেওয়ার ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তিত হয়েছে। আবার রোজ সন্ধ্যায় তুলসীর পাদদেশে প্রদীপ জ্বালিয়ে ও শঙ্খধ্বনি করে তৎকালীন গ্রাম্য এবং বন্য জীবনে গৃহস্থকে বন্য জীবজন্তু ও সাপখোপ থেকে রক্ষা করারও বন্দোবস্ত নেওয়া হয়েছিল। তাই শাস্ত্রকারদের তুলসী মাহাত্ম্য কীর্তন সমাজের উপকারার্থে জন মানসে প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যেই অর্পিত হয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে

মহাভারতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো জ্বলজ্বল করছে। তাই কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রটি মহাভারতের পাতায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এবং এই কুরুক্ষেত্রের কথা ভারতের আপামর জনসাধারণের মনের মুকুরে সদাই উদ্ভাসিত।

দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে এক অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী—সেই পুণ্যতিথি, যে দিন মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ থেকে সকর্ণে শুনেছিলেন গীতার পুণ্য বাণী—মানব জীবনের সারকথা ও কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায় পর্য্যন্ত অংশের নাম 'ভগবদগীতাপর্ব্বাধ্যায়' কিন্তু গীতা আরম্ভ হয়েছে পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তার আগে যা ঘটেছে, সেগুলি পাঠকের সম্যক জানা থাকলে পরবর্তী কার্যকারণগুলি বুঝতে খুবই সুবিধা হবে।

মহাভারতের সভাপর্বে দেখি, খাণ্ডববন দাহনের সময় অর্জুন মহাশিল্পী ময়দানবের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। প্রত্যুৎপকারে ময়দানব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্য স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে দুর্লভ স্ফটিক ও মণিমুক্তা-খচিত এক সভাগৃহ নির্মাণ করেন। এই সভাগৃহের সৌন্দর্য ও কারুকার্য আমন্ত্রিত দুর্যোধনাদির বিশেষ ঈর্ষার উদ্রেক করে। তাই লোভী এবং হিংসুক দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের এই সম্পদ অপহরণের জন্য মামা শকুনির পরামর্শক্রমে ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছানুসারে যুধিষ্ঠিরকে কপট-দ্যুতে আহবান করেন। এই দ্যুত-ক্রীড়ার শর্ত হল, পরাজিত পক্ষ বারো বছর বনবাস ও একবছর অজ্ঞাতবাস করবেন।

দ্যুত-ক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবরা উপরোক্ত বারো বছর বনবাস ও একবছর অজ্ঞাতবাস যথাযথ পালনের পর দুর্যোধনের কাছে নিজ রাজ্য প্রত্যাবর্তনের দাবী জানায়। কিন্তু রাজ্যলিপ্সু দুর্যোধন পাণ্ডবদের সেই ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা তো করলেনই বরং দাম্ভিকতার সঙ্গে বললেন,

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।" কাজেই যুদ্ধ ছাড়া রাজ্য উদ্ধারে পাণ্ডবদের আর অন্য পথ ছিল না।

কৌরব ও পাণ্ডবগণ সসৈন্যে যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হলেন। এই সেই

কুরুক্ষেত্র, যার একপাশে প্রবাহমান নদী সরস্বতী আর অপর পার্শ্ব বিধৌত হচ্ছে স্বচ্ছসলিলা দৃষদ্বতী নদীর স্রোতধারায়। পুণ্যভূমি এই কুরুক্ষেত্রেই কুঠারধারী মহাবীর পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করার পর পিতৃতর্পণ করেছিলেন। কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ছিলেন। তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ। রাজা কুরু এখানে তপস্যা করে একটি বিশেষ বর লাভ করেন। তারই ফলে যিনি এই ক্ষেত্রে তপস্যা করবেন বা যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করবেন তিনি অক্ষয় স্বর্গবাসী হবেন। কাজেই এই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করলে হারা বা জেতা দুটোই লাভের। কারণ যুদ্ধে জিতলে বিজয়ীদল পাবেন বিজয়ের সম্মান ও আনন্দ আর যাঁরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ দেবেন তাঁদের লাভ হবে অক্ষয় স্বর্গবাস। এই সমস্ত কারণে কৌরব ও পাণ্ডবগণ উভয়পক্ষই পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত করেছিলেন।

বীরশ্রেষ্ঠ পার্থ সুদৃশ্য ছত্রশোভিত শ্বেততুরঙ্গ বাহিত কপিধবজ রথে আরোহণ করলেন। বীরের হাতে তখন অগ্নিপ্রদত্ত বিশ্বজয়ী গাণ্ডীব আর পৃষ্ঠে তীরশলাকাপূর্ণ যুগ্ম অক্ষয় তূণ। আর এই রথের সারথি কেশব স্বয়ং।

প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের, এমন কি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধের পরিকল্পনাটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের। কিন্তু পাণ্ডব এবং কৌরব উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিকট আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। তাই শ্রীকৃষ্ণ যদি পাণ্ডব পক্ষ হয়ে অস্ত্রধারণ করেন তবে তিনি পক্ষপাত দুষ্ট দোষে কালিমালিপ্ত হন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তেই শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উপস্থিতি অপরিহার্য। বিভিন্ন সঙ্কটজনক মুহূর্তে ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বা প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণ এমন একটি পথ গ্রহণ করলেন যেখানে তিনি সমালোচনার ঊর্ধে থেকে নিজ উদ্দেশ্য সহজেই সাধন করতে পারেন।

অনন্তর ভগবান জনার্দন সেনামধ্যে অবস্থিত রণদুর্ম্মদ রাজপুত্র ধনঞ্জয়কে বললেন, "হে অর্জুন! যিনি সেনামধ্যে অবস্থান করে রোষাবেগে সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে আকৃষ্ট করছেন, ইনিই পিতামহ ভীষ্ম। কৌরব সেনাগণ তাঁকে সর্বত্র ভাবে রক্ষা করছে। এদেরকে বিনষ্ট করে মহাবীর ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

ভগবান বাসুদেব দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করে অর্জুনের হিতার্থ পুনরায় তাঁকে শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত পবিত্র ও সংগ্রামাভিমুখ হয়ে সর্বশক্তিপ্রদায়িনী দুর্গার স্তব করতে বললেন।

পার্থ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে রথ হতে অবতীর্ণ হয়ে নানা ভাবে বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত করে দেবী দুর্গার স্তব করলেন। তখন অদৃশ্যলোক থেকে ভেসে এলো মা দুর্গার বাণী—"পাণ্ডুপুত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয় করবে, কারণ নারায়ণ তোমায় সহায় এবং তুমিও নর-ঋষির অবতার।" এই বলে মা দুর্গা অন্তর্হিত হলেন।

গাণ্ডীবধারী অর্জুন মা দুর্গার কাছ থেকে বর পেয়ে বুঝলেন যে জয় তাঁদের করায়ত্ত। তাই তিনি নবোৎসাহে কেশবাধিষ্ঠিত রথে আরোহণ করে পিতামহ ভীষ্মের যুদ্ধারম্ভের ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এমন সময় আকাশ-বাতাস মথিত করে বজ্র নির্ঘোষে বেজে উঠল পিতামহ ভীষ্মদেবের শঙ্খ। এই শঙ্খধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ এবং সহদেবের মণিপুষ্পক নামক শঙ্খগুলি একই যোগে বেজে উঠে ভীষ্মদেবের শঙ্খধনির প্রত্যুত্তর দিল। এই ভাবে শঙ্খধনির সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শুরু হয় যুদ্ধের এক অভুতপূর্ব উন্মাদনা। অস্ত্র নিক্ষেপের সময় উপস্থিত।

সেই সময় মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন প্রতিপক্ষ রণোন্মুখ কৌরবগণকে দেখবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে উভয় পক্ষের সেনার মাঝখানে রথটি স্থাপন করতে বললেন—

"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে শ্বেত অশ্ববাহী কপিধ্বজ সম্বলিত রথটি স্থাপন করে বললেন, "হে পার্থ! যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত কৌরবদের দর্শন কর।"

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবদের রাজসভায় গিয়েছিলেন। এই যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল আগেই তিনি অবগত ছিলেন। তাই এই সর্বনাশা যুদ্ধ বন্ধের জন্য তিনি খুবই সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর পাণ্ডবরাও অর্ধেক রাজত্বের পরিবর্তে মাত্র পাঁচখানি গ্রাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ও অহঙ্কারী দুর্যোধন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও পাণ্ডবদের এই ন্যূনতম প্রস্তাবও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অতএব যুদ্ধের ডঙ্কা নিনাদ বেজে উঠেছিল। অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তির বৃংহতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি আর বীরদের সমরসজ্জার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধকে আর রোধ করা গেল না। অহঙ্কারীর অপরিমেয় অহংকার অন্যায়কারীর অবিমিশ্রতা ও অধর্মের চক্রযানকে বন্ধ করতেই অর্জুন এই রণক্ষেত্রে গাণ্ডীব ধারণ করেছেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত বিষয়টি পর্য্যালোচনা করার জন্য তিনি রণক্ষেত্রের মাঝখানে উপস্থিত হতে চেয়েছেন।

অর্জুন তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান কৌরবগণকে নিরীক্ষণ করলেন। এঁদের মধ্যে আছেন পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রশিক্ষাগুরু আচার্য দ্রোণ, কুলগুরু কৃপাচার্য, ভ্রাতাগণ, আত্মীয় পরিজন ও অন্যান্য বন্ধুগণ। এঁরা কেউ তাঁকে স্নেহে বা অপত্য স্নেহে লালন পালন করেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ বা ছিলেন তাঁর খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু ও যৌবনের বয়স্য। আবার কেউ প্রিয় ও সম্মানীয় আত্মীয়বন্ধু। এঁদের বিরুদ্ধে তাঁকে মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে হবে। তা কেমন করে সম্ভব? এই দৃশ্য শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরের

মনে তুলেছে প্রবল আন্দোলন এবং তা ক্রমে পরিস্ফুট হয়েছে বহিরঙ্গে। পার্থের চোখের পল্লব কম্পমান, মুখমণ্ডল ঘর্মসিক্ত, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবসাদ গ্রস্ত। গাণ্ডীব ধনু বীরের হাত থেকে পতিত হয়ে রথের উপর লুণ্ঠিত হচ্ছে। অর্জুন আর যুদ্ধ করতে চাইছেন না। এবং এই যুদ্ধ না করার পক্ষে তিনি অনেক যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির করেছেন। অর্জুন বলেছেন, হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ তো আমারই আত্মীয় স্বজন, তাই আমি বিশ্বাস করি না যে এঁদের হত্যা করলে সুখ আমার করায়ত্ত হবে। আমি যুদ্ধে জয় লাভ চাই না। রাজ্য ও সুখ ভোগও কামনা করি না,—

'ন কাঙেক্ষ বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।'

আবার বলেছেন, "হে গোবিন্দ! আমরা যদি আত্মীয়গণকে বধ করে রাজ্য ও সুখ ভোগ করি তাতেই বা আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ ও স্বজনগণ প্রভৃতি এঁরা আমাদের একান্ত আপনজন। আমাদের এই জাগতিক জীবনে এঁরাই আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, হাসি ও আনন্দের অংশীদার। লতা যেমন বৃক্ষ শাখাকে আশ্রয় করে উপরের সূর্য্যের আলোর দিকে এগিয়ে যায় তেমনি আত্মীয়তার বন্ধনের উপর নির্ভর করেই আমরা উপরে আনন্দলোকে পৌঁছাই। তাই আত্মীয় হত্যা করে স্বর্গ সুখ রচনা করার প্রয়াসই বৃথা। হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তো আমাদেরই ভাই। আমাদের শরীরে শিরা-উপশিরায় একই বংশের একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব ভ্রাতৃহত্যা করে আমি এই রক্তঋণ কি ভাবে শোধ করব?"

অবশেষে অর্জুন বললেন যে, তাঁর ভ্রাতা কৌরবগণ যদি তাঁকে যুদ্ধে নিহত করেন তবে তিনি সানন্দে সেই মৃত্যুবরণ করবেন। এই কথা বলে তিনি যে যুদ্ধে প্রকৃতই নিস্পৃহ তারই সমর্থনে সমস্ত অস্ত্র পরিত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়লেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মানসিক অবস্থাটি পূর্ণভাবে অনুধাবন করলেন। তিনি বললেন, হে অর্জুন! এই সঙ্কটকালে তুমি এমন মোহগ্রস্ত হলে কেন? তুমি যে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব তা স্মরণ কর। হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—

'ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।'

অর্জুন উত্তর দিলেন, "হে শত্রুহন্তা কৃষ্ণ, আমি কেমন করে পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম এবং অস্ত্রগুরু আচার্য দ্রোণের প্রতি প্রাণঘাতী শর নিক্ষেপ করব? গুরুজন বধ না করে সব কিছু ত্যাগ করে ভিক্ষান্নে কালাতিপাত করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এই যুদ্ধের ফলাফল কি রূপে মঙ্গলদায়িনী হতে পারে তা অনুধাবন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হে কৃষ্ণ, তুমি জ্ঞানী, তুমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আমি তোমার শিষ্য, আমাকে শিক্ষা দাও—

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।'

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথি। তাই রথবাহক অশ্বের লাগামগুলি শ্রীকৃষ্ণের হাতে। কিন্তু অর্জুন এখন তাঁর জীবনরথের অশ্বের লাগাম সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে। এখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁর নিরন্তা ও পরিচালক।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মানসিক পরিবর্তনটি লক্ষ্য করে তাঁর কাছে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে যুদ্ধে মনোযোগী করতে সচেষ্ট হলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মানুষের আত্মাই আসল। আর এই জৈবিক দেহটি ঐ আত্মার আবরণ মাত্র। আত্মা—নিত্য, অক্ষয় ও অমর এবং এই আত্মা মৃত্যুর উর্ধ্বে ; মৃত্যুর শীতল হস্তের স্পর্শের নাগালের বাইরে। কারণ এই আত্মার জন্মই নেই তাই মৃত্যুও নেই। আর মানবদেহ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল। তাই হে অর্জুন, তুমি বৃথাই নিজেকে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও পরিজনদের হত্যাকারী রূপে চিহ্নিত করে ভীত হচ্ছো। কারণ তোমার করাল মৃত্যুরূপী বাণ কোনো আত্মাকেই ভেদ করতে পারবে না। অতএব তুমি কখনই হত্যাকারী রূপে পরিগণিত হবে না।

সখা মহাধনুর্ধর অর্জুনের হৃদয়ে এই ভাব প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তেঽয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।।

(গীতা, ২/২২-২৪)

—মানুষের পরিধান সময়ের সাপেক্ষে জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নূতন পরিধেয় ক্রমশ জীর্ণ হয় এবং পরিধানের অনুপযুক্ত হলে মানুষ সেগুলি স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করে। কারণ জীর্ণ বস্ত্রের প্রতি মানুষের আর কোন মোহ থাকে না এবং এটি পরিত্যাগে সে কখনো শোক করে না। তেমনি মানুষের আত্মাই মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব। তাঁর জন্ম নেই তাই তিনি মৃত্যুর অতীত। আত্মা নিত্য, অবিনশ্বর। এই আত্মা শুধুমাত্র দেহকেই আশ্রয় করে থাকে। মানবদেহ শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের গণ্ডী পার হতে গিয়ে ক্রমশঃ জীর্ণই হয়। এই জীর্ণতার ফলস্বরূপ অস্থি-মজ্জা সম্বলিত দেহের ধবংস বা মৃত্যু। কিন্তু আত্মার 'আমি' শৈশব থেকে

বার্ধক্যে উপনীত হবার সময় কোনো ধাপই অতিক্রম করে না। তাই শৈশবের আত্মা বার্ধক্যেও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কিন্তু বার্ধক্যের জীর্ণ দেহ আত্মার আশ্রয়ের অনুপযোগী। তাই অবিনশ্বর আত্মা অবলীলাক্রমে শোক বা দুঃখ প্রকাশ না করে জীর্ণ বস্ত্রের মতো জীর্ণদেহকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করে নতুন দেহকে আশ্রয় করে। তাই হে বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি স্থিতধী হয়ে বিবেচনা করে দেখ তোমার শর সন্ধান আত্মার সন্ধানে গিয়ে ব্যর্থ হবে, শুধুমাত্র অনিত্য দেহটিকেই ছিন্ন ভিন্ন করতে পারবে। তুমি নিশ্চিত রূপে জানবে আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত। অর্থাৎ কোনো অস্ত্র দ্বারাই আত্মাকে খণ্ডিত করা যায় না, তা সে অস্ত্র যতই ক্ষুরধার হোক না কেন। অগ্নির দাহিকা শক্তি সর্বব্যাপী হলেও আত্মা আগুনের নিকট দাহ্য পদার্থ নয়। জগতে এমন কোনো পদার্থ নেই যা কোন না কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু আত্মার দ্রবণ অসম্ভব। প্রবল বাত্যাপ্রবাহও আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না। আর আমাদের প্রবল শক্তিশালী পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ও আত্মার অনুভব করতে গিয়ে সদাই ব্যর্থ হয়। সুতরাং দেহের বিনাশ হয় সত্য কিন্তু যেহেতু আত্মা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী নিত্য বস্তু সেহেতু তোমার আত্মীয় নিধনের আশঙ্কায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই।

তাই হে পার্থ, তুমি যদি ধর্মের কথা ভাবো, তাহলে তোমাকে যুদ্ধ করতেই হবে। কারণ কুরুক্ষেত্রের এই মহাযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধেরই নামান্তর। ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্মই সতত ধর্মযুদ্ধে যোগদান করা এবং এই যোগদান ক্ষাত্রধর্মোচিত। হে মহাবাহো, তুমি যদি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণে বিরত থাক তবে পাপ তোমায় আশ্রয় করবে। যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করলে তুমি স্বর্গবাসী হবে, আর জয় লাভে রাজ্য সুখ ভোগ করবে। কাজেই সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়কে সমান ভেবে নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব অনুধাবন করিয়ে তাঁকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করেছেন। অর্জুনের মনে যেটুকু দ্বন্দ্ব ছিল তাও সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় শ্রীকৃষ্ণের আত্মপরিচয় এবং বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মধ্যে। অর্জুন বুঝলেন তিনি তো নিমিত্ত মাত্র। জগতের সমস্ত ঘটনারই নিয়ন্তা স্বয়ং পরমেশ্বর।

পরিশেষে অর্জুন বলেছেন, হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমি মোহমুক্ত হয়েছি। তুমি আমার অজ্ঞানতা ও সন্দেহকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেছো। এখন আমি আমার কর্তব্যে স্থির হয়েছি। তোমার প্রদর্শিত পথই আমার কর্মের রূপরেখা।

'ন হন্যতে'

মহারণাঙ্গন কুরুক্ষেত্র। পাণ্ডব এবং কৌরব পক্ষের বীরগণ সসৈন্যে উপস্থিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যে শ্বেতাশ্ব বাহিত কপিধ্বজ রথারূঢ় পাণ্ডব সেনাপতি অর্জুন যুদ্ধারম্ভে প্রস্তুত। তেমনই প্রস্তুত মহাবীর ভীষ্ম পরিচালিত কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধাগণ। এখন শুধু যুদ্ধারম্ভের একটি মাত্র ইঙ্গিতের অপেক্ষা।

এমন সময় আকাশ বাতাস মথিত করে বজ্র নির্ঘোষে বেজে উঠল পিতামহ ভীষ্মদেবের শঙ্খ। এই শঙ্খধবনি কর্ণ কুহরে প্রবেশ মাত্র শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ এবং সহদেবের মণিপুষ্পক নামক শঙ্খগুলি একযোগে বেজে উঠে ভীষ্মদেবের শঙ্খধনির প্রত্যুত্তর দিল। এইভাবে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রণাঙ্গনে শুরু হয় যুদ্ধের এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। অস্ত্র নিক্ষেপের সময় উপস্থিত।

সেই সময় অর্জুন যুদ্ধার্থ উপস্থিত উভয়পক্ষীয় আত্মীয়-পরিজনদের দেখে আত্মীয়বধের আশঙ্কায় বিচলিত হলেন। কারণ এঁদের মধ্যে আছেন পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রশিক্ষাগুরু আচার্য দ্রোণ, কুলগুরু কৃপাচার্য, ভ্রাতাগণ, আত্মীয়-পরিজন ও অন্যান্য বন্ধুগণ। এঁরা কেউ তাঁকে অপত্য স্নেহে লালন পালন করেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন। কেউ বা ছিলেন তাঁর খেলার সাথী, কৈশোরের বন্ধু ও যৌবনের বয়স্য। আবার কেউ বা প্রিয় ও সম্মানীয় আত্মীয় বন্ধু। এঁদের বিরুদ্ধে তাঁকে মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে হবে। এই দৃশ্য শ্রেষ্ঠ ধর্নুধরের মনে তুলেছে প্রবল আন্দোলন এবং তা ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে বহিরঙ্গে, পার্থের চক্ষের পল্লব কম্পমান, মুখমণ্ডল ঘর্মসিক্ত, বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবসাদগ্রস্ত, গাণ্ডীব হাত থেকে পতিত হয়ে রথের উপর লুণ্ঠিত। তিনি আর যুদ্ধ করতে চাইছেন না। এবং এই যুদ্ধ না করার পক্ষে তিনি অনেক যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির করেছেন। অর্জুন বলেছেন, "হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধে প্রতিপক্ষ তো আমারই আত্মীয়স্বজন, তাই আমি বিশ্বাস করি না যে এঁদের হত্যা করলে সুখ আমার করায়ত্ত হবে। আমি যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই না, রাজ্য ও সুখভোগও কামনা করি না"—

'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং ন চ রাজ্যং সুখানি চ।'

আবার বলেছেন, "হে গোবিন্দ! আমরা যদি আত্মীয়গণকে বধ করে রাজ্য

ও সুখ ভোগ করি তাতেই বা আমাদের সুখের সম্ভাবনা কোথায়? কারণ আচার্যগণ, পিতৃব্যগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ ও স্বজনগণ প্রভৃতি এঁরাই আমাদের একান্ত আপনজন। আমাদের এই জাগতিক জীবনে এঁরাই আমাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী, হাসি ও আনন্দের অংশীদার। লতা যেমন বৃক্ষ শাখাকে আশ্রয় করে উপরের সূর্যের আলোর দিকে এগিয়ে যায় তেমনি আত্মীয়তার বন্ধনের উপর নির্ভর করেই আমরা আনন্দলোকে পৌঁছাই। তাই আত্মীয় হত্যা করে স্বর্গসুখ রচনা করার প্রয়াসই বৃথা। হে জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তো আমাদেরই ভাই। আমাদের শরীরে শিরা-উপশিরায় একই বংশের একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব ভ্রাতৃহত্যা করে আমি এই রক্তঋণ কি ভাবে পরিশোধ করব?"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের বিভিন্ন উক্তি থেকে তাঁর যুদ্ধের নিস্পৃহতার আসল কারণটি উপলব্ধি করলেন। তাই তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটিও সুচারুরূপে সম্পন্ন করলেন। শ্রীভগবান তাঁর কাছে জন্মমৃত্যুর রহস্য, আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়ে যুদ্ধে মনোযোগী করতে সচেষ্ট হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মানুষের আত্মাই আসল। আর এই জৈবিক দেহটি ঐ আত্মার আবরণ মাত্র। আত্মা—নিত্য, অক্ষয় ও অমর। এবং এই আত্মা মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, মৃত্যুর শীতল হস্তের স্পর্শের নাগালের বাইরে। আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। আর মানব দেহ—অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল। হে অর্জুন, তুমি বৃথাই নিজেকে আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও পরিজনদের হত্যাকারীরূপে চিহ্নিত করে ভীত হচ্ছো। তোমার করাল মৃত্যুরূপী বাণ কোনো আত্মাকেই ভেদ করতে পারে না।

অতএব তুমি কখনই হত্যাকারীরূপে পরিগণিত হবে না। সখা মহাধনুর্ধর অর্জুনের হৃদয়ে এই ভাব প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।।
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।।

(গীতা, ২/২২-২৪)

—মানুষের পরিধান সময়ের সাপেক্ষে জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নতুন পরিধেয় ক্রমশঃ জীর্ণ হয় এবং পরিধানের অনুপযুক্ত হলে মানুষ সেগুলি স্বচ্ছন্দে

পরিত্যাগ করে। কারণ জীর্ণ বস্ত্রের প্রতি মানুষের আর কোন মোহ থাকে না এবং এটি পরিত্যাগে সে কখনো শোক করে না। তেমনি মানুষের আত্মাই মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব। তাঁর জন্ম নেই তাই তিনি মৃত্যুর অতীত। আত্মা নিত্য, অবিনশ্বর। এই আত্মা শুধুমাত্র দেহকেই আশ্রয় করে থাকে। মানবদেহ শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের গণ্ডী পার হতে গিয়ে ক্রমশঃ জীর্ণই হয়। এই জীর্ণতার ফলস্বরূপ অস্থি-মজ্জা সম্বলিত দেহের ধবংস বা মৃত্যু। কিন্তু আত্মার 'আমি' শৈশব থেকে বার্ধক্যে উপনীত হবার সময় কোনো ধাপই অতিক্রম করে না। তাই শৈশবের আত্মা বার্ধক্যেও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কিন্তু বার্ধক্যের জীর্ণ দেহ আত্মার আশ্রয়ের অনুপযোগী। তাই অবিনশ্বর আত্মা অবলীলাক্রমে শোক বা দুঃখ প্রকাশ না করে জীর্ণ বস্ত্রের মতো জীর্ণদেহকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করে নতুন দেহকে আশ্রয় করে। হে বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি স্থিতধী হয়ে বিবেচনা করে দেখ তোমার শর সন্ধান আত্মার সন্ধানে গিয়ে ব্যর্থ হবে, শুধুমাত্র অনিত্য দেহটিকেই ছিন্ন ভিন্ন করতে পারবে। তুমি নিশ্চিত রূপে জানবে আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য এবং ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ কোনো অস্ত্র দ্বারাই আত্মাকে খণ্ডিত করা যায় না, তা সে অস্ত্র যতই ক্ষুরধার হোক না কেন। অগ্নির দাহিকা শক্তি সর্বগ্রাসী হলেও আত্মা অগ্নির নিকট দাহ্য পদার্থ নয়। জগতে এমন কোনো পদার্থ নেই যা কোন না কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু আত্মার দ্রবণ অসম্ভব। প্রবল বাত্যাপ্রবাহও আত্মাকে শুষ্ক করতে পারে না। আর আমাদের প্রবল শক্তিশালী পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ও আত্মার অনুভব করতে গিয়ে সদাই ব্যর্থ হয়। সুতরাং দেহের বিনাশ হয় সত্য কিন্তু যেহেতু আত্মা দেহাতিরিক্ত অবিনাশী নিত্য বস্তু সেহেতু তোমার আত্মীয় নিধনের আশঙ্কায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ নেই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা সমগ্র মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে এই উপদেশ দিয়েছেন যে কোনো অবস্থাতেই মানুষের নিজধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। নিজের সমূহ ক্ষতি বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকলেও অথবা সাময়িক কিছু লাভ হলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নয়। বরং নিজের প্রাণ আহুতি দিয়েও নিজের ধর্ম রক্ষা করা কর্তব্য;

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।

(গীতা ৩/৩৫)

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে স্বহস্তে স্বজনবর্গ নিধন জনিত পাপবোধের আশঙ্কা অর্জুনকে বিহবল করে তোলে। যুদ্ধ ত্যাগেচ্ছু অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ করেন। তৎকালীন সমাজে পাপ ক্রিয়া বন্ধ করার এবং সুস্থ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধই ছিল একমাত্র পথ। তাই শ্রীকৃষ্ণ নিজ উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য অর্জুনের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তোলেন সেই চেতনা যার ফলে অর্জুন বুঝতে পারেন যে এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের তিনি ক্রীড়নকই মাত্র। স্বধর্ম পালনে আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না।

জীবজগতে মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ। আর এই মনুষ্য জন্ম পেতে হলে জীবকে তার সুকর্ম্মজাত সংস্কারের ফলে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট যোনি হতে উৎকৃষ্ট যোনির মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করতে হয়। মনুষ্যই একমাত্র আত্মজ্ঞানের সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারে। প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে এই সংসারে বিচরণ বিদেশে ভ্রমণ মাত্র। আর মৃত্যুই সেই পথ যার মধ্য দিয়ে অহংবোধহীন মনুষ্য নিজ দেশ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তিতত্ত্বতঃ।।

(গীতা, ৭/৩)

অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ে ভগবদ্ উপলব্ধির অন্যতম পথ হচ্ছে ভক্তিযোগ। এই ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমসত্তাকে উপলব্ধি করা যায় বা তাঁর স্বরূপ জানা যায়। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো একজন মাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরসত্তার উপলব্ধিতে সচেষ্ট হন। আবার হাজার হাজার ভক্তিমার্গের সাধকের মধ্যে হয়তো একজনই মাত্র পরমসত্তার স্বরূপ উপলব্ধিতে সফলকাম হন।

চাঁদের কলঙ্ক ও ফুলের কাঁটার মত এই সুন্দর পৃথিবীতে রজঃ তমোগুণ সম্পন্ন ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য ও দম্ভবশীভূত লোকের অভাব নেই। এই আসুরিক প্রবৃত্তিযুক্ত মানুষেরা অজ্ঞান তিমিরে নিমগ্ন হয়ে ঈশ্বর বিমুখ হয়ে থাকে। কিন্তু এদের ঈশ্বরমুখী বা দমন করার জন্য এবং পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য ভগবান স্বয়ং বারে বারে আবির্ভূত হন এই মাটির পৃথিবীতে। এইরূপে তিনি এসেছিলেন দ্বাপর যুগে কৃষ্ণরূপে। কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করে তিনি যেমন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেছিলেন তেমনই এই মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনকে সামনে রেখে সমগ্র মানবজাতিকে উপদেশ ও অভয়দান করেছেন—

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।

(গীতা, ১১/৫৫)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই মহাবাণীর তাৎপর্য হল— যে ব্যক্তি আমারই কর্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন, আমি যাঁর একমাত্র গতি, যিনি সর্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, যিনি সমস্ত বিষয়ে আসক্তিশূন্য, যাঁর কারও উপর শত্রুভাব নেই তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন।

অহংবোধে বিবর্জিত মানুষের মধ্যে 'আমি' থাকতে পারে না। আমিত্বের বিসর্জন দিয়ে সমস্ত কর্মের কর্তা যদি ভগবানকে করা যায় তবে ঐ কর্মের জন্য ফলভোগ করতে হয় না। নির্লিপ্ত ভাবে ভগবদ্‌পদে সব কিছু সমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ। আর প্রকৃতপক্ষে মানুষতো ভগবানের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। এইরূপ মুক্ত পুরুষ স্বধর্ম পালন হেতু সমস্ত লোককে হত্যা করলেও তা হিংসাত্মক কর্ম বলে গণ্য হবে না এবং সেই কারণে তাঁর সংসারে বন্ধনও হবে না। লোকের প্রাণনাশ হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি হত্যাকারী নন এবং হত্যা কর্মের ফলভোগীও নন।

অথ পঞ্চস্বামী কথা

সংসার জীবন খুবই সমস্যা-সঙ্কুল। জটিলতা যে কোন সময়ে যে কোন ভাবে উঠতে পারে। তাই জীবনের গণ্ডীর মধ্যে কেউ যদি জটিলতাকে স্পর্শ না করে এটা খুবই আশ্চর্যেব ব্যাপার।

পাণ্ডবদেব উত্তর পুরুষ জনমেজয়। এই জনমেজয়ের মনেব মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগে যে, তাঁর প্রপিতামহ পঞ্চপাণ্ডব এক স্ত্রী দ্রৌপদীকে নিযে কিভাবে কালাতিপাত করেছিলেন?

কারণ তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এক পুরুষেব একাধিক স্ত্রী থাকতে পারত। রাজা রাজড়াদের বেলায় তো কথাই নেই। তাঁদের অন্তঃপুরের মহিষীদের সংখ্যা ছিল অগুন্তি। সেখানে একাধিক মহিষীর অবস্থানের জন্য এই মহিষীদের মধ্যে নানাবকম অতৃপ্তি ও অনুযোগ নিশ্চয়ই থাকতো। কিন্তু মানসিকভাবে তাঁরা এটা স্বীকার করে নিতেন। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের ব্যাপারটা উল্টো। এখানে মহিষী একজন কিন্তু তাঁর স্বামীর সংখ্যা এক নয় একাধিক — পাঁচজন।

তাই প্রশ্ন এই পঞ্চপাণ্ডব এক মহিষী পাঞ্চালীর সঙ্গে কিভাবে শান্তিতে বাস করেছিলেন বা পাঞ্চালী কি ভাবে এই পঞ্চস্বামীকে সমভাবে পরিতৃপ্ত করতেন?

বেদ পুরাণের যুগ থেকে সর্বকালেই দেখা গেছে যে নারীর উপর অধিকারের তারতম্যের কাবণে পুরুষদের মধ্যে শুধু মনোমালিন্যই নয়, হানাহানিও হয়েছে বারেবারে।

জনমেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে বৈশম্পায়ন বললেন যে, জনমেজয়ের প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। পঞ্চপাণ্ডবের পারস্পরিক ভ্রাতৃপ্রীতি ও আনুগত্য তুলনাবিহীন এবং দ্রৌপদীও বিচক্ষণা বুদ্ধিমতী ভার্যা হিসাবে পঞ্চস্বামীর সেবা সমভাবেই করে আসছিলেন। পঞ্চভ্রাতার মনে কোনদিন প্রশ্ন জাগেনি যে, দ্রৌপদীর প্রশ্নে তাঁদের মনে বিভেদ আসতে পারে। তাই দেবর্ষি নারদ যখন এই পঞ্চভ্রাতাকে ডেকে বললেন যে, দ্রৌপদীর প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে কিছু নিয়মকানুন থাকা দরকার এবং নিয়মকানুনে তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি এই পঞ্চভ্রাতার কাছে পূর্বঘটিত সুন্দ ও উপসুন্দের ঘটনাটি বিবৃত করেন।

মহাসুর হিরণ্যকশিপুর বংশে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভাইয়ের জন্ম

হয়েছিল। এদের মধ্যে এরূপ সৌহার্দ্য ছিল যে, তারা একত্র শয়ন, ভোজন, গমনাগমন এবং রাজ্য শাসন করত। তারা ছিল যেন একই বৃন্তে দুইটি ফুল।

কিছুদিন পরে সুন্দ ও উপসুন্দ এই দুই ভাই ত্রিলোক বিজয়ের কামনায় বিন্ধ্যপর্বতে গিয়ে অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করল। জটা-বল্কলধারী এই দুই ভাই তপোনুষ্ঠানকালে ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র বায়ুই ভক্ষণ করত। ব্রহ্মার মনস্তুষ্টির জন্য তারা নিজেদের গায়ের মাংস কেটে আগুনে আহুতি দিত এবং অনিমেষলোচন ও উর্দ্ধবাহু হয়ে চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকত। এইভাবে তারা দীর্ঘকালব্যাপী বহু কষ্টসাধ্য তপস্যা করল।

এই তপস্যায় প্রজাপতি ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে তাদের বর দিতে চাইলে তারা অমরত্ব প্রার্থনা করল। কিন্তু ব্রহ্মা তাদের পূর্ণ অমরত্ব দেবার অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তখন দুই ভাই এই বর প্রার্থনা করল যে, ত্রিলোকের যাবতীয় স্থাবর বা জঙ্গম পদার্থ হতে তাদের কোন ভয় না থাকে, কেবল তারা পরস্পরকে সংহার করতে পারবে। ব্রহ্মা তাদের প্রার্থিত বর দিলেন।

মনোমত বর লাভ করে তারা স্বীয় জটাবল্কল পরিত্যাগ করে মস্তকে কিরীট, দেহে রত্ন-খচিত পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে দৈত্য-পুরীতে বন্ধুবর্গের সহিত ভোগবিলাসে মগ্ন হল। ক্রমে তাদের মনে দেবলোক জয় করতে ইচ্ছা জাগল এবং তারা দেবলোকে প্রবেশ করল।

দেবগণ ব্রহ্মার বরের বিষয় জানতে পেরে স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করে ব্রহ্মালোকে আশ্রয় নিলেন। ক্রমে সুন্দ ও উপসুন্দ ইন্দ্রলোক জয় করে যক্ষ-রক্ষ প্রভৃতি খেচরগণের প্রাণসংহার, পাতালবাসী নাগ প্রভৃতি সকলকেই জয় করল এবং আশ্রম-বাসী তপস্বীদের উপর অত্যাচার করতে লাগল।

ঐ-দুই ভাইয়ের দৌরাত্ম্যে ভগবান্ ব্রহ্মা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে তাদের সংহার করবার বাসনায় বিশ্বকর্মাকে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী নির্মাণ করতে আদেশ করলেন।

ত্রিলোকের স্থাবর জঙ্গম থেকে যে সব বস্তু অতিমনোরম বিশ্বকর্ম্মা সেইসব বস্তু সংগ্রহ করে এক অতুলনীয়া রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। মূর্তিমতী লক্ষ্মীরূপা সেই কামিনী সর্বভূতের মনোনয়নহারিণী হলেন। এই মূর্তি জগতের উত্তম রত্নসমূহের তিল তিল অংশ নিয়ে নির্মিত হয়েছিল বলে ভগবান ব্রহ্মা তার নাম রাখলেন তিলোত্তমা।

ভগবান ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে আদেশ করলেন যে, সুন্দ ও উপসুন্দ দুই ভাইকে প্রলোভিত করতে, যাতে এই দুই ভাই তাঁর রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে পরস্পর বিরোধ করে।

সুন্দ ও উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পে সুশোভিত

এলাকায় সুরাপানে মত্ত হয়ে বিহার করছিল। এই সময় এই পুষ্প উদ্যানের অদূরে তারা দেখল মনোহারিণী এক রূপসীকে, যে রঙীন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে ফুলের বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রমণীর পেলব দেহকান্তি ও সুডৌল গঠনকে সূক্ষ্মবেশবাস আর ধরে রাখতে পারছে না। কল্লোলিনী এই কন্যার মুক্তশুভ্র দন্তরাজি ও বিম্বোষ্ঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকল হাসির লহরা যা বিদ্যুতের ঝলক্‌কেও হার মানায়। চম্পাকলির মতো অঙ্গুলীর হেলন ও আয়ত চক্ষুর গভীর আহ্বান যে কোনো পুরুষের মতিভ্রমের কারণ হয়। তদুপরি কাঁচুলীর বন্ধনে পীড়িত উদ্ধত বক্ষদেশ, ক্ষীণকটি ও জঘন শোভিত নিতম্বদেশ মদন দেবতার ফুলধনু থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তার কাম-জর্জরিত শর। তাই সুন্দ ও উপসুন্দ জ্ঞানশূন্য হয়ে শুধু কামের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে একজন তিলোত্তমার ডান হাত এবং অপরজন তাঁর বাঁ হাত ধরল। উভয়েই একই যোগে তিলোত্তমাকে স্ত্রীরূপে ভোগ করার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা প্রকাশ করল। এই আকাঙ্খা ক্রমশঃ দাবী ও অধিকারের প্রশ্নে পারস্পরিক সংঘর্ষে পরিণত হল।

উপাখ্যান শেষ করে দেবর্ষি নারদ বললেন যে, এই দুই ভাই সুন্দ ও উপসুন্দ বাল্যকাল থেকেই সর্ববিষয়ে মিলিত ও একমত হয়েও তারা একই নারীকে স্ত্রী রূপে পাবার বাসনায় নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও সংগ্রামের ফলে উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই দেবর্ষির বক্তব্য যে, যদিও পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভ্রাতৃস্নেহ ও ভালোবাসা পবস্পরকে একই সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে তবুও পাঞ্চালীর প্রশ্নে সুন্দ ও উপসুন্দের মতো তাঁরা পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে যেতে পারেন। তাই পঞ্চপাণ্ডব এবং পাঞ্চালীর মধ্যে একটা নিয়ম হওয়া প্রয়োজন।

মুনিবরের কথায় যুধিষ্ঠিরসহ পঞ্চপাণ্ডব একটি নিয়ম প্রবর্তনে সাগ্রহে রাজী হলেন। এবং ঠিক হল এক ভাই যখন দ্রৌপদীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করবে সেই সময় অন্য ভাই তথায় প্রবেশ করবে না। যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করবে, তাঁকে বারো বছর বনবাস করতে হবে। এই নিয়ম মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছিলেন। এবং এটা প্রমাণিত সত্য। কারণ এই নিয়ম লঙঘন করে অর্জুন নিজেই বারো বছরের জন্য বনবাসী হয়েছিলেন।

এক ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার্থে অর্জুনের অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়াতে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে হয়েছিল। তিনি দেখেন যে সেই অস্ত্রাগারে তখন একান্তে জ্যেষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে বসে ছিলেন দ্রৌপদী। ক্ষাত্রধর্ম রক্ষার্থে তিনি অস্ত্র নিয়ে ঐ ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার করলেন।

মহাত্মা অর্জুন এই ভাবে ব্রাহ্মণের উপকার করে স্বভবনে প্রত্যাগমন করলেন এবং পূর্ববিধান মেনে নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্ধিধায় বললেন, “আদেশ

করুন, আর্য! নিয়ম লঙঘনের জন্য আমি দ্বাদশ বৎসরের বনবাসের শাস্তি গ্রহণ করতে চাই।"

ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জুনের মুখে এই কথা শুনে দুঃখিত হলেন। নিজেকে তাঁর এতই অপরাধী বলে মনে হল যে, তিনি যেন থতমত খেয়ে বললেন, "অর্জুন, তুমি তো আমাকে খুবই মান্য কর এবং আমার সমস্ত কথাই মেনে চল। তা আমায় যদি মানো, তবে শোন—তোমার কোন অন্যায়ই হয় নি। পত্নীসহ অবস্থানকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ঘরে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নেই। প্রিয় ভাই অর্জুন! এতে তোমার কোন অধর্ম হবে না। দোষ হত যদি আমি ঢুকতাম তোমার ঘরে। আমার ঘরে ঢুকে তুমি একটুও অন্যায় কর নি।"

কিন্তু সত্যসাধক অর্জুন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "তুমিই শিখিয়েছ কি করে ধর্মপথে থাকতে হয় আর এও বলেছ—ছল করে ধর্মাচারণ করা উচিত নয়।" জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে অর্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনবাসে যাত্রা করলেন।

এইভাবে পঞ্চপাণ্ডব নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক রেখেছিলেন। এদিকে দ্রৌপদীও তাঁর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পঞ্চস্বামীকে সমভাবে সেবা করে পঞ্চ স্বামীরই মনস্তুষ্টি করতে পেরেছিলেন। দ্রৌপদী এবং কৃষ্ণমহিষী সত্যভামার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পঞ্চস্বামীর মনস্তুষ্টি করার পন্থার গূঢ় সত্যটি আমরা জানতে পারি।

দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী; কিন্তু সকলের নিকটই দ্রৌপদী সমভাবেই প্রিয়। তাই সত্যভামা দ্রৌপদীকে প্রশ্ন করেন, "সখি! তোমার পাঁচটি লোকপাল তুল্য স্বামীকে তুমি বশ করেছ কি কামশাস্ত্র প্রয়োগ করে বা কোন মন্ত্র বা ওষুধের দ্বারা?"

এই প্রশ্ন শুনে দ্রৌপদী প্রথমেই প্রশ্নের ধরনটিতে একটু কটাক্ষ প্রকাশ করে বললেন, "সখি! তোমার জানা উচিত নিম্নজাতির স্ত্রীরাই ঐরূপ বিদ্যা স্বামীদের উপর প্রয়োগ ক'রে স্বামীদের বশ করার চেষ্টা করে। তবে আমি ঐ প্রথার কোনটিই গ্রহণ করি নি। আমি স্বামীদের সহিত প্রকৃত স্ত্রী সুলভই আচরণ করি। তাঁদের পরিচর্যার ভার ঝি-চাকরদের উপর না রেখে নিজেই সেই কাজ সম্পন্ন করি। স্বামী গৃহে আগমন করলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে স্বামীর আসন গ্রহণে সাহায্য করি। নিজের ক্ষুৎপিপাসা দূরে রেখে স্বামীর আহারের পূর্বে কখনই আহার করি না। স্বামীর কাছে কখনই নিজের ক্রোধ প্রকাশ করি না। এমনকি সপত্নীদেরসহও আমি সুখে আছি এই ভাবেই আমি স্বামীদের নিকট প্রণয় প্রকাশ করে থাকি।"

পঞ্চপাণ্ডবের জন্ম নেপথ্য

রাজা জনমেজয় ছিলেন পাণ্ডবদের উত্তরপুরুষ। একদা এই কৌতূহলী জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্মবৃত্তান্ত জানার জন্য ঋষিবর বৈশম্পায়নের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তখন ঋষি বৈশম্পায়ন বললেন যে, রাজা জনমেজয়ের এই অনুসন্ধিৎসা খুবই ন্যায্য। এই বলে তিনি সেই পূর্ব ইতিহাসের বর্ণন শুরু করলেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন তাই কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজসিংহাসন পেলেন। পাণ্ডু রাজা হয়ে প্রবল প্রতাপে দিগ্বিজয় ও রাজ্যবিস্তার করতে থাকেন।

যদুবংশের রাজা শূরসেন তাঁর পৃথা নামে কন্যাটি পিসতুতো ভাই কুন্তিভোজকে দান করেন। কুন্তিভোজ এই কন্যারত্নটিকে নিজ সন্তান তুল্য পরম যত্নে লালন পালন করতে লাগলেন। তাই কুন্তিভোজের নামানুকরণে পৃথার নতুন নাম হল কুন্তী। আর কুন্তীও তাঁর এই নবলব্ধ পিতার স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হয়ে শশীকলার ন্যায় দিনে দিনে রূপ লাবণ্যে মহিমময়ী হয়ে যৌবনের পূর্ণ রূপলাবণ্যের খ্যাতিতে মনুষ্য সমাজে বন্দিত হতে লাগলেন।

ভোজরাজ তার প্রিয়কন্যা কুন্তীর উপযুক্ত পতি নির্বাচনের জন্য সাড়ম্বরে একটি স্বয়ংবর সভার আয়োজন করে সমস্ত রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ জানালেন। কুন্তীর স্বয়ংবর সভার বর্ণনায় আছে,

ততঃ সা রঙ্গমধ্যস্থং তেষাং রাজ্ঞাং মনস্বিনী
দদর্শ রাজশার্দ্দূলং পাণ্ডুং ভরত সত্তমম্।।৪।।
সিংহদর্পং মহোরস্কাং বৃষভাক্ষং মহাবলম
আদিত্যমিব সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং প্রচ্ছাদ্য বৈ প্রভাঃ
তিষ্ঠন্তঃ রাজসমিতৌ পুরন্দরমিবাপরম।।৫।।

(মহাভারত, আদি পর্ব, ১১৬/৪-৫)

অর্থাৎ মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশে পতি মনোনীত করতে হাতে ফুলের মালা নিয়ে রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন, সেখানে ভরতবংশের মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্যসদৃশ অনুপম স্বীয় শরীরপ্রভা দ্বারা সমস্ত ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করে রয়েছেন। তাঁর প্রতাপ সিংহসম, বক্ষোদেশ প্রশস্ত এবং

নয়নযুগল বিকচকমলসদৃশ, দেখলে স্পষ্ট বোধ হয়, যেন পুরন্দর স্বপুর পরিত্যাগ করে কুন্তী কামনায় সভায় উপস্থিত হয়েছেন।

কুন্তিভোজ কন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হল। এই পরিণয়ে উভয়েই সুখী। বিবাহের পর নবপরিণীতা বধূ কুন্তীকে নিয়ে মহারাজ পাণ্ডু তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। ভোজরাজ পাণ্ডুর হাতে শুধুমাত্র কন্যারত্নটিই অর্পণ করেননি, যৌতুক হিসাবে দিয়েছেন পর্যাপ্ত মণিমুক্তা, অশেষ ধনরাশি ও দর্শনীয় অন্যান্য প্রচুর সামগ্রী।

হস্তিনাপুরের রাজান্তঃপুরে এই নবদম্পতির প্রতিটি মুহূর্তই হয়ে উঠেছিল এক রসঘন ও নিবিড় মিলনোৎসব। এই বিবাহের আনন্দমদিরতা কাটতে না কাটতেই শান্তনুনন্দন ভীষ্মদেব মদ্ররাজনন্দিনী মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ দেন। মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীসহ স্বীয় ভবনে পরম সুখে কাল যাপন করতে লাগলেন।

কিছুদিন পর মহরাজ পাণ্ডু রাজ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে পত্নীদ্বয়সহ বনবিহার বাসনায় বনে গমন করলেন। বনমধ্যে ভার্যাদ্বয়সহ মহারাজ পাণ্ডুর এই বনবিহারকে কবির ভাষায় হস্তিনীসহ গজরাজের বন পরিক্রমার সঙ্গে তুলনীয়। আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহারাজ পাণ্ডু যখন বনভূমিতে বিচরণ করতেন তখন বনবাসীগণ তাঁকে দেবতা বলে মনে করতো। হস্তিনাপুরের রাজ-ভৃত্যগণ এই অরণ্য ভূমিতেও মহারাজ পাণ্ডুর জন্য ভোজ্য ও বিলাসদ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আসতো। এইভাবে বনবিহারে পাণ্ডু কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

একদিন মহারাজ পাণ্ডু মহারণ্যমধ্যে ভ্রমণ করতে করতে এক মৃগমিথুনকে শরবিদ্ধ করলেন। তখন পুরুষ মৃগটি তার আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছিল, “মহারাজ, আমি কিন্দম মুনি, পুত্র কামনায় হরিণরূপ ধারণ করে হরিণীরূপিণী ভার্য্যার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তুমি জানতে না যে আমি ব্রাহ্মণ সে জন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু সঙ্গমসময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হয়েছে, তার ফল অবশ্যই তোমাকে ভোগ করতে হবে। তুমি যে সময়ে স্ত্রী-সংসর্গ করবে, সেই সময়ে তোমার মৃত্যু হবে।” মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডু রাজাকে এই অভিশাপ দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মৃগরূপধারী মুনির শাপে পাণ্ডু অতিশয় ভীত হয়ে পড়লেন। এবং তিনি সংসার ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের সংকল্প গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি ভার্য্যাদ্বয় কুন্তী ও মাদ্রীকে বললেন—

কৌশল্যা বিদুরঃ ক্ষত্তা রাজা চ সহ বন্ধুভিঃ।
আর্য্যা সত্যবতী ভীষ্মস্তেচ রাজপুরোহিতা।।২৪।।
ব্রাহ্মণাশ্চ মহাত্মনঃ সোমপাঃ শংসিতব্রতাঃ

পৌরবৃদ্ধাশ্চ যে তত্র নিবসন্ত্যস্মদাশ্রয়াঃ
প্রসাদ সর্বে বক্তব্যাঃ পাণ্ডুঃ প্রব্রাজিতো বনম্।।২৫।।

(মহাভারত, আদিপর্ব।,১১৩/২৪-২৫)

অর্থাৎ তোমরা হস্তিনানগরে গিয়ে কৌশল্যা, বিদুর, সবান্ধব রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আর্যা সত্যবতী, ভীষ্ম, রাজপুরোহিতগণ, কঠোর সংযমী ব্রাহ্মণগণ ও আশ্রিত পৌরবদিগকে অনুনয় করে এই কথা বলবে যে, পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন, আর গৃহে আসবেন না।

কুন্তী ও মাদ্রী যখন বুঝলেন যে, স্বামী পাণ্ডু অবশ্যই প্রব্রজ্যাগ্রহণ করবেন, তখন তাঁরা দুইজনেই পাণ্ডুর সহগামিনী হতে প্রচেষ্ট হলেন। তাঁরা বললেন যে, তাঁদের মতো পতিগতপ্রাণা পত্নীদের স্বামী বিরহ সহ্য করে রাজসুখের মধ্যে বাস করা কখনই সম্ভব নয়। উপরন্তু তাঁরা পাণ্ডুকে এই কথাই বললেন যে, তাঁরা কখনও পাণ্ডুর ধর্মাচারণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। স্বামীর প্রদর্শিত পথই হবে তাঁদের পথ। স্বামীর গৃহীত জীবন ধারাই হবে তাঁদের জীবন। তাই তাঁদেব দুইজনকে সঙ্গে রাখতে পাণ্ডুর বাধা কোথায়! আর পাণ্ডু যদি একান্ত তাঁদের সঙ্গে না নিয়ে যেতে চান তবে স্বামী বিরহ সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণই তাঁদের শ্রেয়।

তখন পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়ের অঙ্গের অলঙ্কার ও অন্যান্য ধনরাশি কিছু ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন আর অবশিষ্টাংশ হস্তিনাপুরে পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে মহীপতি পাণ্ডু কন্দর্পহীন হয়ে কৃচ্ছসাধনের পথ গ্রহণ করলেন। তিনি পত্নীদ্বয়সহ অতি বন্ধুর পার্বত্যপথ অতিক্রম করে অবশেষে শতশৃঙ্গ পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যার ফলে তাঁর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হল এবং তিনি তাপসপ্রবর এক শ্রেষ্ঠ মহর্ষিতুল্য হয়ে উঠলেন।

একদিন শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ মিলিত হয়ে ভগবান ব্রহ্মাকে দর্শন করবার জন্য ব্রহ্মলোকে যাত্রা শুরু করলে, তপস্বী পাণ্ডু পত্নীদ্বয়সহ তাঁদের সঙ্গী হতে চাইলেন। তখন মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে নিরস্ত করার জন্য বললেন যে, ব্রহ্মলোকের পথ অতি দুর্গম এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অনতিক্রম্য তো বটেই তাছাড়া মহর্ষিগণ আরও একটি বিষয় উত্থাপন করলেন সেটি হল যে, মনুষ্যজন্মের চতুর্বিধ ঋণ শোধ না হলে স্বর্গ লাভ হয় না। ধর্মানুসারে দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুষ্যঋণ থেকে মুক্ত হয়েছেন তিনি কিন্তু পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। পুত্র লাভ না হলে পিতৃঋণ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মনু স্মৃতিতে বলা হয়েছে,

"পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনম্।"

—যেহেতু পিণ্ড লাভের জন্য পুত্রের প্রয়োজন সেই হেতু পুত্র লাভের জন্য স্ত্রীরও প্রয়োজন।

পাণ্ডু তাঁর পুত্রোৎপাদনে অক্ষমতার কথা জানিয়ে ঋষিদের কাছে সমাধানের

নির্দেশ চাইলেন। তিনি তাঁর নিজ জন্মের নেপথ্য কাহিনীর উল্লেখ করে বললেন যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে রূপে তাঁর পিতার ক্ষেত্রে তাঁকে উৎপাদন করেছেন, সেই পন্থাতে তিনিও কি কোন পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে পারেন কি না। তখন তাপসগণ বললেন—

অস্তি বৈ তব ধর্ম্মাতত্মন্! বিদ্মে দেবোপমং শুভম্।
অপত্যমনঘং রাজন! বয়ং দিব্যেন চক্ষুষা।।
দৈবোদ্দিষ্টং নরব্যাঘ্র! কর্ম্মণে হোপপাদয়।
অক্লিষ্টং ফলমব্যাগ্রো বিন্দতে বুদ্ধিমান্নরঃ।।
তস্মিন্ দৃষ্টে ফলে রাজন্। প্রযত্নং কর্ত্তুমহর্ষি।
অপত্যং গুণসম্পন্নং লব্ধাপ্রতিকরং হ্যসি।।

(মহাভারত, আদিপর্ব ১১৪/১৪-২৬)

অর্থাৎ ধার্মিক মহারাজ, আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার একটি দেবতুল্য কল্যাণময় নিষ্পাপ পুত্র বিদ্যমান। দৈব যা নির্দিষ্ট করেছে মহারাজ তা সম্পন্ন করুন। বুদ্ধিমান লোকেরা ব্যস্ত না হয়ে অনায়াসে সে ফল লাভ করেন। হে রাজা, আমরা দিব্যচক্ষে যা দেখলুম আপনি সেই ফললাভের জন্য যত্ন করুন। আপনি অবশ্যই গুণ সম্পন্ন পুত্র লাভ করবেন।

রাজর্ষি পাণ্ডুর মহর্ষিদের উপদেশে পিণ্ডপ্রাপ্তির প্রয়োজনে পুত্রের প্রয়োজন আছে এটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করলেন। তাই ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনে প্রথমে আপত্তি থাকলেও এই পরিস্থিতিতে তিনি পুত্র প্রাপ্তির আশায় ঐ পদ্ধতি গ্রহণে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তিনি কুন্তীর কাছে প্রস্তাব দিলেন যে, কুন্তী যেন সৎ এবং সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করে পাণ্ডুর মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

স্বামীর এই প্রস্তাব শুনে সাধ্বী কুন্তীর মানসপটে ভেসে উঠল অতীত জীবনের একটি দুঃস্বপ্নময় ইতিহাস। যৌবনের প্রারম্ভে চপলমতী কুন্তী দুর্বাসামুনি প্রদত্ত বরের সত্যতা নির্ণয়ে মিলনের আকাঙ্খা নিয়ে আহ্বান করেছিলেন সূর্যদেবকে।

সূর্যদেবের তাৎক্ষণিক উপস্থিতিতে বিমূঢ়া কুন্তী পরক্ষণেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সূর্যদেবকে অনুনয়ের সুরে বললেন, "হে দেব! আপনি এই মূঢ় বালিকাকে ক্ষমা করুন। আমি শুধু মাত্র কৌতূহলবশতঃ আপনাকে আহ্বান করেছি। অবোধ নারীদের নির্বুদ্ধিতাও অশেষ এবং এই নির্বোধ নারীদের ক্ষমা করাও একটি দেবসুলভ গুণ, তাই আপনি অনুগ্রহ করে সঙ্গমে ক্ষান্ত দিয়ে আমার কৌমার্য অক্ষত রাখুন।"

কুন্তীর এই করুণ আপত্তিকে সূর্যদেব কোন গুরুত্ব না দিয়ে ভীতি প্রদর্শনে রমণে বাধ্য করেছিলেন।

কিন্তু কুন্তী জীবনব্যাপী এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে গেছেন। তাঁর জীবনের এই লজ্জা তথা প্রথম সন্তানের জন্মদান ও চোখের জলের সঙ্গে নির্জন অতলান্ত নদীর জলের স্রোতে সেই সন্তানকে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা একদিনও মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেন নি।

এই দেবদ্যুতিময় শিশুটি তাঁর সদ্যোজাত সন্তান। একদিকে মাতৃস্নেহ অপর দিকে পিতার কঠোর শাসন ও কলঙ্কের সামাজিক ভীতি। নিরুপায় কুন্তী নিশ্ছিদ্র পেটিকায় সদ্যোজাত সন্তানটিকে আবদ্ধ করে ও পুত্রের মঙ্গল কামনায় স্বস্তি বচন পাঠ করে পুত্রসহ পেটিকাটিকে ভাসিয়ে দিলেন অশ্বনদীর জলে। এই অশ্ব নদী তো প্রকৃত পক্ষে কুন্তীর অশ্রুনদী। স্রোতের টানে দূরে আরও দূরে ক্রমে পেটিকাটি চলে গেল দৃষ্টিপথের বাইরে। আর কুন্তী ফিরে এলেন রাজদেউলের মধ্যে। কিন্তু অন্তরের নিভৃত কোণে রয়ে গেল সেই অপসৃয়মান পেটিকার মধ্যে রাখা একটি নধর কচি মুখের ছায়া।

সেদিন ঐ মন্ত্রের যথার্থতা পরীক্ষার জন্য বালিকাসুলভ কৌতূহলবশতঃ কুন্তী সূর্যদেবকে আহ্বান করেছিলেন। আজ আবার তাঁকে প্রিয় স্বামীর অনুরোধে সেই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তাই কুন্তী স্বামীপ্রদত্ত প্রস্তাবের পক্ষে অনিচ্ছাই প্রকাশ করলেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে পাণ্ডু ধর্মশাস্ত্রের উল্লেখ করে বললেন,—

ইমে বৈ বন্ধু দায়াদাঃ ষট্ পুত্রা ধর্ম্মদর্শনে।
ষাড়বা বন্ধুদায়াদাঃ পুত্রাস্তন্ শৃনু মে পৃথে।।

(মহাভারত, আদিপর্ব, ১১৪/৩৩)

অর্থাৎ হে পৃথে, ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় ছয় প্রকার পুত্র পৈতৃক ধনলাভের অধিকারী হয় আর ছয় প্রকার পুত্র ধনের অধিকারী হয় না।

পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী ছয় প্রকার বলতে ঔরস, প্রণীত, পরিক্রীত, পৌণর্ভব, কানীন, এবং স্বৈরিণীজ।

আর পৈতৃক ধনের অনধিকারী ছয় প্রকার হচ্ছে দত্তক, ক্রীত, কৃত্রিম, স্বয়ংদত্ত, সহোঢ় ও শৌদ্র (পারশর)।

উপরোক্ত সারণীতে গুরুত্ব অনুসারে পুত্রদের নাম পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রথমটির অভাবে দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয়টির অভাবে তৃতীয়, তৃতীয়ের অভাবে চতুর্থ এবং এই অনুরূপে পুত্রদের পুত্র বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পাণ্ডু আরও বললেন যে, বিশেষ বিশেষ সময়ে রমণীগণ স্বীয় ইচ্ছানুসারে স্বামীর সহোদর বা উপযুক্ত পুরুষের দ্বারা গর্ভাধান করিয়ে থাকেন। এবং স্বয়ম্ভুব মুনি বলেছেন ঔরস পুত্র অপেক্ষ প্রণীত পুত্র শ্রেষ্ঠ। এই বলে তিনি পূর্বঘটিত একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, "পূর্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর পত্নী শারদণ্ডায়নী ঋতুস্নান সমাপনান্তে বিচিত্র পুষ্পমাল্য ধারণ

পূর্বক রজনীযোগে চতুষ্পথে উপস্থিত হলেন। তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণ পুরঃসর অনলে পুংসবন হোম সম্পাদন করলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জয়াদি মহাবলপরাক্রান্ত মহারথ পুত্রত্রয় উৎপাদন করেছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করতে যত্নবতী হও।"

পতিগতপ্রাণা কুন্তী পরম জ্ঞানী স্বামী পাণ্ডুর ঐ রূপ উপদেশ তথা অনুরোধে ব্যথিত হয়ে পুরাকালে পুরুবংশীয় পরম ধার্মিক ব্যুষিতাশ্ব রাজার কাহিনী শোনালেন। পরমরূপবতী ভদ্রা নামে কাক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী ছিলেন। এই রাজা যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে যৌবনকালেই মারা যান। ভদ্রা মৃত পতিকে আলিঙ্গন করে আকুল ক্রন্দনে বিলাপ করছিলেন, এমন সময়ে আকাশবাণী শুনতে পেলেন, "হে প্রিয়তমে! বিলাপ কোরো না, ওঠো যাও। হে চারুহাসিনি! আমি তোমাকে বর প্রদান করছি। তুমি চতুর্দ্দশী বা অষ্টমীতে ঋতুস্নান করে আমার সঙ্গে নিজ শয্যায় শয়ন করবে, তা হলে আমি স্বীয় শবে আবির্ভূত হয়ে তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করব।"

দৈববাণী অনুযায়ী মৃত স্বামীর সংসর্গের ফলে ভদ্রা সাতটি সন্তানের জননী হবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন।

তাই কুন্তী রাজা ব্যুষিতাশ্বের ঘটনাটি উল্লেখ করে বললেন যে, যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় পত্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে পত্নীর সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন তেমনি রাজাধিরাজ পাণ্ডুও যেন স্বীয় পত্নী কুন্তীর গর্ভে তাঁর মানসপুত্র উৎপাদন করে বংশরক্ষাসহ পত্নীর সতীত্ব রক্ষা করেন।

কুন্তীর মুখে উপরোক্ত ঘটনাটি শুনে পাণ্ডু বললেন, "প্রিয়ে, তোমার কথা সত্য বটে কিন্তু আমি রাজা ব্যুষিতাশ্বের মতো শক্তিমান নয়। এই পথ গ্রহণ করার চিন্তা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তাই আমি প্রাচীন ঋষিগণ কথিত ধর্ম্মতত্ত্ব বলছি তুমি অনুধাবন কর।

পুরাকালে স্ত্রীলোকের বহুগামিতা সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক নিয়ে মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এই বিধান দিয়েছিলেন যে, স্বামীর পরামর্শ ক্রমে স্ত্রী ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনে অনাগ্রহী হলে সেই স্ত্রীকে ভ্রূণ হত্যার দায়ে দায়ী হতে হবে। পাণ্ডু আরও বললেন যে, কল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী পতির প্রিয় কামনায় বশিষ্ঠ মুনির ঔরসে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করেছিলেন।

অবশেষে বললেন যে, তিনি নিজেই সামাজিক ভাবে স্বীকৃত ক্ষেত্রজ সন্তান। কিন্তু স্বয়ং সন্তানোৎপাদনে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাঁর প্রিয় পত্নীকে সুমিষ্ট সম্ভাষণে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে বললেন যে, কুন্তী যদি কোন সৎ এবং ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করেন তবে তাতে তিনি জীবৎকালে পরম সুখী হবেন এবং মরণোত্তরে তাঁর আত্মা পরম শান্তি লাভ করবে।

পরম পতি ভক্তিময়ী কুন্তী স্বামীর পুত্র লাভের আগ্রহ অনুধাবন করে স্বামীর সন্তুষ্টি বিধানে স্বামী প্রদত্ত শর্তে সম্মতি দান করলেন। তখন স্বামীকে দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রের কথা জানিয়ে বললেন যে, তিনি ঐ প্রদত্ত মন্ত্রের ক্ষমতায় তাঁর মনোমতো পুরুষকে রমণে আহ্বান জানাতে পারেন।

অতঃপর কুন্তী সবিনয়ে পাণ্ডুকে বললেন, "হে নাথ, তুমি আমার ইহকাল, পরকাল। তাই তুমিই আমাকে আদেশ কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য কোন্ দেবতাকে আহ্বান জানাব।"

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীর কথায় প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'হে সুন্দরী, দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, লোকমধ্যে তিনিই প্রকৃত পুণ্যভাজন, তাঁকে আহ্বান কর। ধর্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্মিক হবে সন্দেহ নেই, তার মন কখনো অধর্মে প্রবৃত্ত হবে না, অতএব ধর্ম্মপুরস্কারেই কর্ম্ম করা আমাদের কর্তব্য, তুমি পরম সমাদর পূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করে তাঁর দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর।"

পতিপরায়ণা কুন্তী স্বামীর আজ্ঞানুসারে দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্র পাঠ করে ধর্ম্মরাজকে আহবান করায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে কুন্তী তথা পাণ্ডুর কামনা পূর্ণ করলেন। সন্তানের জন্মকালে দৈববাণী হয়েছিল যে, এ শিশু পরম ধার্মিক, সত্যবাদী ও পৃথিবীপতি হবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে পরিচিত হবেন। ইনি কুন্তীর গর্ভজাত দ্বিতীয় এবং পাণ্ডুর প্রথম ক্ষেত্রজ সন্তান।

রাজর্ষি পাণ্ডু পরম ধার্মিক পুত্র লাভ করেও পুত্রের আকাঙ্খা তবু মেটেনি। তিনি বলবান পুত্রের জন্য আবার অনুরোধ করলেন কুন্তীকে। কুন্তী তখন মন্ত্রপাঠ পূর্বক পবনদেবকে আহবান জানালেন। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র ভীমই হলেন পরম বিক্রমশালী পবনদেবের ঔরসপুত্র।

ভীমের জন্মের পর পাণ্ডু পুনর্বার বীরশ্রেষ্ঠ পুত্রলাভের চিন্তা করতে লাগলেন। এবং মহর্ষিগণের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তীকে সাংবৎসরকাল মাঙ্গলিক ব্রত পালন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনা করতে বললেন।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে দুর্ব্বাসাদত্ত মন্ত্র জপ করে ইন্দ্রদেবকে আবাহন করলেন। ইন্দ্রদেবকে সন্তুষ্ট করে পেলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে। এই অর্জুনের জন্ম এক রাজকীয় ব্যাপার। জন্ম মাত্র দৈববাণী, দুন্দুভিনিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হল। কুন্তী একাগ্র চিত্তে ছিলেন। শুনলেন, 'হে পৃথে, তোমার, এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলবানদিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করে তাঁর নিকট হতে পাশুপত নামে মহাস্ত্র লাভ করবেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞানুসারে দেবগণের পরমশত্রু নিবাতকবচ নামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করে বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করবেন।"

অর্জুনের জন্মের পর রাজর্ষি পাণ্ডু আরও পুত্রলাভের লোভে কুন্তীকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিন পুত্রের জননী হয়ে কুন্তী পুনরায় গর্ভাধান করতে রাজী হলেন না। তিনি মহারাজ পাণ্ডুকে বিভিন্ন শাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন যে, তাঁর তিনটির বেশী পুত্র হওয়া কখনই মঙ্গলদায়ক নয়।

এদিকে কুন্তী এবং গান্ধারী এই দুই জনকে পুত্রবতী দেখে পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী পুত্রবতী হওয়ার আশায় পাণ্ডুর শরণাপন্ন হলেন। তিনি পাণ্ডুকে বোঝালেন যে, তাঁর পুত্রাকাঙ্ক্ষা কুন্তী এবং গান্ধারীর প্রতি হিংসাবশতঃ নয়, তবে তিনি স্বীয় আত্মজের মুখ দর্শনে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁর পক্ষে সপত্নী কুন্তীর কাছে নিজের সন্তান আকাঙ্ক্ষার কথা বলা যায় না। তাই তিনি এই ব্যাপারে কুন্তীর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাণ্ডুর উপরই ভার দিলেন। অতঃপর রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীর কাছে মাদ্রীর মনোস্কামনা ব্যক্ত করে বললেন, "হে প্রিয়তমে, আমি তোমাকে মাদ্রীর একটি বিশেষ অনুরোধ অবহিত করতে চাই। মাদ্রী নিজ সন্তানের মুখ দর্শনে খুবই আগ্রহী এবং আমিও এই ব্যাপারে মাদ্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই আমার বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করে তাকে পুত্রবতী হওয়ায় সাহায্য কর। এতে তোমার যশ এবং গৌরব বর্ধনই হবে।

পাণ্ডুর অভিপ্রায় জেনে কুন্তী সহোদরা সদৃশা সপত্নী মাদ্রীকে বললেন, "তুমি তোমার মনোমতো যে কোন দেবতাকে আহ্বান কর। তিনিই তোমাকে মাতৃত্ব লাভে সহায়তা করবেন।"

মাদ্রী কুন্তীর আদেশ মত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আরাধনা করে যমজ পুত্র লাভ করলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁদের জন্মক্ষণে দৈববাণী হল, "হে কুমারদ্বয়! তোমরা অশ্বিনী কুমার অপেক্ষা সমধিক সত্তসম্পন্ন, রূপবান্, গুণশালী ও তেজস্বী হয়ে পরম সুখে কালযাপন কর।"

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই দেবতুল্য রূপবান, মহাতেজস্বী পুত্রগণকে দেখে আনন্দসাগরে মগ্ন হলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে বহু সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষায় রাজর্ষি পাণ্ডু মাদ্রীর গর্ভে পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করলেন। তখন কুন্তী মহারাজের ইচ্ছা পূরণে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন যে, মাদ্রীকে একবার সুযোগ দেওয়াতে সে একবারেই দুই দেবতাকে আহ্বান করে একই সঙ্গে নিজ গর্ভে দুই পুত্র উৎপাদনের কর্মটি অতি চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। এই পদ্ধতি তাঁর নিজেরও অজানা ছিল। তাই তিনি মাদ্রীকে এই ব্যাপারে আরও সুযোগ দিতে ইচ্ছুক নন।

কুন্তীর কথা শুনে রাজর্ষি পাণ্ডু অগত্যা তাতে সম্মত হয়ে নিরস্ত হলেন। মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবতুল্য পঞ্চপুত্র লাভ করে পরম সুখে শতশৃঙ্গ পর্বতে কাল যাপন করতে লাগলেন।

যমরাজ অথ ধর্মরাজ

ঋগ্বেদমতে, যমরাজের নাম প্রায় পঞ্চাশবার উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের মতে, যমরাজ বিবস্বানের পুত্র, তাঁর জননীর নাম সরণ্যু। যমের পুরীর নাম 'অস্ত'। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪ নং সূক্তে আট নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে—

সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূতনে পরমে ব্যোমন।

হিত্বা আবদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বাসুর্বচাঃ।।

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে দাহ করার সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বলতে হয়—সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হও, মিলিত হও যমরাজের সঙ্গে এবং তোমার ধর্মানুষ্ঠানের ফলের সঙ্গে। পাপ পরিত্যাগপূর্বক 'অস্ত' নামক যমপুরীতে প্রবেশ করে উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর।

মানুষের মৃত্যুর পর যমরাজই মানুষকে অন্য লোকে নিয়ে যান। তখন তিনিই হন পথ প্রদর্শক। কিন্তু প্রশ্ন কোথায় নিয়ে যান এবং কাদের কি ভাবে নিয়ে যান?

ঋগ্বেদে রাজা যমের যে প্রাসাদের বর্ণনা পাই তা অতি মনোরম স্থান। উচ্চ হর্ম্যরাজী সুশোভিত করা হয়েছে স্ফটিকের দ্বারা, এই প্রাসাদের কারুকার্য দেব হস্তে খোদিত হয়েছে। সুন্দর সুন্দর পুষ্করিণী শোভিত রসাল এবং সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ এবং সুগন্ধি ও সুন্দর পত্র পুষ্প শোভিত এই মনোরম স্থান সর্বদা সুললিত সঙ্গীত ও সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে থাকে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণকে যমরাজ এই স্থানেই বিশ্রাম করবার সুযোগ দেন। তাই 'যমের বাড়ি যাও' এটি একটি অপ্রিয় বাক্য হলেও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণের পক্ষে এটি একটি আশীর্বাদ স্বরূপ।

কঠোপনিষদে যমরাজকে আমরা পাই পরম জ্ঞানদাতারূপে। এই উপনিষদে যমরাজ সম্বন্ধে যা বিবরণ আছে অর্থাৎ তিনি অগ্নিবিদ্যায় পারঙ্গম এবং ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা, এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

কঠোপনিষদ ও মহাভারতে যম ও নচিকেতা সম্বন্ধীয় দুটি সুন্দর উপাখ্যান আছে, তাতে কিছু পার্থক্য থাকলেও মূলত একই রকম। কঠোপনিষদের নচিকেতা বাজশ্রবস্ মুনির পুত্র। আর মহাভারতের নচিকেতা উদ্দালক ঋষির পুত্র, দুইজনেই পিতৃশাপে যমভবন দর্শন করেছিলেন।

একসময় বাজশ্রবস্ মুনি স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বজিত যজ্ঞের আয়োজন করে ছিলেন। শাস্ত্রের নিয়মানুসারে যজ্ঞে যথা সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাস্বরূপ দান

করলে তবেই যজ্ঞের সুফল হয়। নচিকেতা নামে মহর্ষি বাজশ্রবসের একটি সদাচার নিষ্ঠ সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র ছিলেন। যজ্ঞে দানের জন্য প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী দেখে বালক নচিকেতার মন আনন্দে ভরে উঠল কিন্তু দানের জন্য গাভীগুলিকে দেখে তাঁর মন বিষাদে ভরে গেল। কারণ এই যজ্ঞ শেষে তাঁর পিতা যে গাভীগুলি দান করছিলেন সেগুলি দানের উপযুক্ত ছিল না। তাই পিতার দানের গাভীগুলি দেখে তাঁর মনে হল যে পিতার স্বর্গলাভ না হয়ে পরলোকে তাঁর অধোগতিই হবে। কারণ গাভীগুলি—

পীতোদোকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান স গচ্ছতি তা দদৎ।।

(কঠোপনিষদ, ১/১/৩)

এত বৃদ্ধ যে, এদের জলপান, ঘাস খাওয়া আর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে গেছে। চোখে কানে দেখা শোনার পালাও শেষ হয়েছে। এই অযোগ্য গাভীগুলি দানের ফলে পিতা আনন্দ নাম নিরানন্দ দুঃখময় লোকে গমন করবেন। এই কথা চিন্তা করে নচিকেতা পিতার কাছে যজ্ঞাগ্নির ধারে উঠে এলেন এবং পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

ততঃ কস্মৈ মা দাস্যসি? (কঠোপনিষদ, ১/১/৪)

অর্থাৎ বাবা আমায় কাকে দান করবেন? পুত্র নচিকেতার এই কথার উত্তর না দিয়ে তিনি নীরব রইলেন। কিন্তু একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার করাতে তিনি ধৈর্যচ্যুত হলেন এবং ক্রোধবশে বললেন, "মৃত্যবে ত্বা দদামি"— তোমাকে যমের হস্তে দিলাম।

পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে মৃত্যুপথ যাত্রী হলেন বালক নচিকেতা। যম ভবনে উপস্থিত হয়ে দেখেন যমরাজ বাড়ি নেই। তিনদিন পরে যমরাজ প্রাসাদে ফিরে এসে ব্রাহ্মণ তনয় নচিকেতাকে অপেক্ষা করতে দেখে সবিনয়ে বললেন—

"তিস্রো রাত্রীর্যদবাৎসীগৃহে মেহই
নশ্নন্ ব্রহ্মণ্নতিথির্নমস্যঃ।
নমস্তেহস্তু ব্রহ্মণ্ স্বস্তি মেহস্তু
তস্মাৎ প্রতি ত্রীণ্ বরাণ্ বৃণীষ্ব।।" (কঠোপনিষদ, ১/১/৯)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মণ, তুমি আমার অতিথি ও নমস্য, অথচ তিন রাত্রি আমার প্রাসাদে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছ। তোমাকে নমস্কার করি। অনাহারে তিন রাত্রি থাকার জন্য তুমি তিনটি বর প্রার্থনা কর।

প্রথম বরে নচিকেতা প্রার্থনা করলেন রুষ্ট পিতার প্রসন্নতা। বললেন, আপনার নিকট হতে আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি যেন সস্নেহে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরেন।

যমরাজ প্রার্থিত বর দিলেন।

অতঃপর নচিকেতা যমরাজের নিকট দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করে বললেন, "হে যমরাজ, স্বর্গলোক সুখের স্থান, সেখানে ভয় নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই, ব্যাধি নেই, ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, বীতশোক মানুষ নিত্যানন্দে বাস করে সেই লোকে। সেই স্বর্গ লাভের সাধনভূত অগ্নিবিদ্যা বিষয়ক উপদেশ দান করুন।"

যমরাজ বললেন, "হে নচিকেতা, দ্বিতীয় বরে তুমি যা প্রার্থনা করেছ, স্বর্গলাভের উপায় স্বরূপ সেই অগ্নি বিষয়ক বরই তোমাকে প্রদান করলাম।"

অগ্নিবিদ্যাপ্রাপ্তির পর নচিকেতা তৃতীয় বরে চাইলেন, 'হে যমরাজ, মানুষ মরে গেলে, কেউ বলেন পরলোকগামী আত্মা আছে, আবার কেউ বলেন—এই শরীরের মৃত্যু হলে, আর কিছু থাকে না। এই আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণই নেই। কিন্তু মোক্ষলাভের জন্য আত্মার প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে সমূহ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। অতএব আপনি বিতর্কিত আত্মার সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।"

বালক নচিকেতার কথা শুনে যমরাজ বললেন, "হে কুমার, তুমি আত্মতত্ত্ব শুনে কি করবে? আত্মতত্ত্ব নিয়ে দেবকুলও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, অতি গুহ্য, অতি দুর্জ্ঞেয়। ধন, ঐশ্বর্য, পুত্র ও পৌত্র সমূহ প্রার্থনা কর এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ ও পৃথিবীতে বিশাল ভূ-ভাগ প্রার্থনা কর কিংবা মৃত্যুহীন জীবন প্রার্থনা কর। এই যে সুখদায়িনী অপ্সরাগণ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নৃত্যগীতাদির দ্বারা এমন মনোমুগ্ধকর সুখ প্রদান করে ঈদৃশী রমণী মনুষ্যের অপ্রাপ্য। এই সব রমণীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদে দিন অতিবাহিত করার ইচ্ছাপূরণ করে দেবো। কিন্তু এই মৃত্যু-বিষয়ক প্রশ্ন তুমি করো না।"

যমরাজের কথা শুনে নচিকেতা স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে যমরাজ তাঁকে কিছু জাগতিক জিনিষের প্রলোভনে তাঁকে প্রলোভিত করে তাঁর মূল প্রশ্ন থেকে নিরুত্তর থেকে তাঁকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। নচিকেতা বালক হলেও তাঁর বিচার-বুদ্ধি প্রাজ্ঞজনের মত। তাই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস প্রাপ্তির বিনিময়ে নচিকেতা যমরাজের আত্মতত্ত্ব শ্রবণের ইচ্ছার পরিবর্তন চাইলেন না।

যমরাজ বুঝতে পারলেন যে নচিকেতাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা সম্ভব নয়। পরন্তু এই ব্রাহ্মণ কুমারের গুহ্য বস্তু জানবার আগ্রহ ও ঐকান্তিকতায় প্রীত যমরাজ আত্মতত্ত্ব জানাতে স্বীকৃত হলেন।

মহাভারতে উল্লেখিত নচিকেতার কাহিনীতে পিতা উদ্দালক ঋষি একদিন তাঁর পুত্র নচিকেতাকে নদীতীরে ফেলে আসা পুষ্পাদিকে আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই পুষ্পাদি নদীর স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। রিক্ত হস্তে পুত্রকে ফিরে আসতে দেখে ঋষি ক্রুদ্ধ হন এবং অভিশাপ দেন, "তুই এখনই যম দর্শন কর।"

এই অভিশাপে নচিকেতা তৎক্ষণাৎ কুশাসনের উপর মৃত অবস্থায় পড়ে যান।

পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর ঋষি হায় হয়ে করে ওঠেন। ঋষি শোক সন্তপ্ত হয়ে এতই বিলাপ করতে থাকেন যে পুরো একটি দিন কেটে যায়। দ্বিতীয় দিনের প্রভাতে সেই শোকাতুর পিতা দেখতে পান পুত্রের প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

পুনর্জীবন প্রাপ্ত নচিকেতার কাছে ঋষি জানতে পারেন যে তাঁর অভিশাপ ছিল 'যম দর্শন কর।' তাই নচিকেতা মরণের পর যমলোকে হাজির হয়ে যমরাজের দর্শন লাভ করে আবার ফিরে আসেন এই মর্তে। যমলোক একদিন অবস্থান কালে যমরাজ নচিকেতাকে মাননীয় অতিথি হিসাবে গ্রহণ করে যমলোকে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। নচিকেতার নিজ চোখে দেখা যমপুরীর সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বর্ণনা অতীব মনোগ্রাহী।

পুরীর মধ্যে স্বর্ণময় নির্মিত সুউচ্চ প্রাসাদগুলি। সুসজ্জিত পথ, সুগন্ধী ও মনোরম ফুল এবং সুস্বাদু ও রসাল ফলের গাছে উদ্যানগুলি সুশোভিত। আনন্দমুখর ভ্রমরের গুঞ্জনে উচ্ছ্বল বনের পরিবেশ। পুরীর মধ্য দিয়ে বৈবস্বতী নদী বয়ে চলেছে। তার সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত জলে ফুটে রয়েছে পদ্ম, এতে খেলে বেড়াচ্ছে কুন্দেন্দু বর্ণ হংস। যমপুরীর অধিবাসীগণ সর্বদাই থাকেন উৎসব মগ্ন। এখানকার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও ঐশ্বর্য স্বর্গরাজ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

যাঁরা সৎকর্মের ফলে স্বর্গবাসের যোগ্য বোধ হয় তাঁদেরই বাসভূমি।

এই পুরীতে প্রবেশের জন্য স্বর্ণময় ও লৌহময় দুইটি পথ আছে। পুণ্যাত্মারা স্বর্ণময় পথে পুরীতে প্রবেশ করেন আর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত যে ভীষণ দর্শন লৌহময় পথ তা প্রচণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত, এই পথ দিয়ে দুরাত্মা, নৃশংস ও পাপিষ্ঠরা প্রবেশ করে।

এর ভিতরেই রয়েছে বিচারালয়। মৃত ব্যক্তিদের এখানে বিচার হয়। মণি-মাণিক্য খচিত সিংহাসনে বসে যমরাজ পাপী ও পুণ্যাত্মা সকলেরই কর্মফলের বিচার করে মৃতের আত্মার গতি বিধান করেন। মর্তধামে মানুষের মৃত্যু হলে যমরাজ কালপুরুষ ও মহাচন্দ নামে দুইজন দুতকে প্রেরণ করেন মৃতের আত্মাকে যমপুরীতে আনতে।

যমরাজের অপর নাম ধর্মরাজ। পুরাণে ধর্মরাজ সম্বন্ধে বহু বিচিত্র কাহিনী পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে, বিশ্বকর্মা কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যদেবের বিবাহ হয়, এই পতি সোহাগিনী সংজ্ঞা তাঁর স্বামী তেজোদীপ্ত সূর্যদেবের প্রখর জ্যোতি সহ্য করতে না পেরে চক্ষু দুটি নিমীলিত করেন। পত্নীর এই ব্যবহারে সূর্যদেব অসন্তুষ্ট হয়ে সংজ্ঞাকে অভিশাপ দেন যে, তাঁর গর্ভস্থ পুত্র সন্তান প্রজাসংযম যম নামে অভিহিত হবেন এবং তিনি জীবকুলকে শাস্তি দিয়ে সংযমে রাখবেন।

স্বামীর এই অভিশাপে সংজ্ঞাদেবী ত্রস্তা হরিণীর মত ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। সূর্যদেব স্ত্রীর মুখমণ্ডল এমনকি সর্ব অবয়বে এই চাঞ্চল্যের ব্যাপ্তি লক্ষ্য

করে পত্নীকে বললেন, "তোমার গর্ভজাত কন্যা তোমার সর্বশরীরের চাঞ্চল্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করবে এবং মর্ত্যধামে দুকূল প্লাবী চঞ্চলা যমুনা নদী নামে পরিচিতা হবে।"

স্কন্দপুরাণ বলেন, ধর্মরাজ পাপাত্মাদের কাছে ঘোর দর্শন ও ভয়ঙ্কর। পাপীদের নির্মম হস্তে সাজা দেবার জন্য ধর্মরাজের সমস্ত অবয়বেই নির্মমতার প্রতিচ্ছবি। পাপাত্মাদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে কোন কারুণ্যই প্রদর্শিত না হওয়ার জন্যই আরক্ত চক্ষু ধর্মরাজের মুখমণ্ডল ক্রোধাগ্নিতে ভাস্বর।

কাশীধামস্থিত মহাদেবের সন্তুষ্টি সাধনের জন্য ধর্মরাজ এক সময় কঠোর তপস্যা করেন। সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব ধর্মরাজকে একটি বর প্রদান করেন। এবং তাবই ফলে পুণ্যাত্মা বিচারের সময় ধর্মরাজের যে রূপ দেখা যায়, পাপীদের বিচারের সময় তারই আবার অন্যরূপ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলেন, মৃত্যুর দেবতা ধর্মরাজ নিত্য জীবের প্রাণ শিকার করে আপন সান্নিধ্যে আকর্ষণ করছেন। কোন এক সময়ে উপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণের অভিশাপ তাঁর উপর বর্ষিত হয়। ঐ ব্রাহ্মণের এক পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়াতে শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মরাজকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি অপুত্রক হও।" ধর্মরাজের অকালে প্রাণহরণরূপ কাজটি মর্ত্যধামে সাংসারিক জীবগণের পক্ষে খুবই দুঃখজনক। তাই এই অভিশাপ ধর্মরাজের উপর অবশ্যই আসতে পারে। ব্রাহ্মণ প্রদত্ত অভিশাপে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ধর্মরাজ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন।

ব্রহ্মা ধর্মরাজের সমূহ অসুবিধার কথা সম্যক ভাবে বুঝতে পারলেন। কিন্তু অকাল মৃত্যু হবেই। তাই ধর্মরাজকে অকালমৃত্যু জনিত দোষারোপ থেকে রেহাই দেবার জন্য মানুষের মৃত্যুর কারণে একশো আটটি রোগের সৃষ্টি করলেন। এবং এই রোগগুলিই হবে অকাল মৃত্যুর পশ্চাৎপদ। তাই মৃত ব্যক্তির শোক সন্তপ্ত আত্মীয়গণ ধর্মরাজকে দায়ী না করে রোগগুলিকে দায়ী করবে। এই ভাবেই ধর্মরাজ মৃতের শোক-সন্তপ্ত আত্মীয়গণের রোষাগ্নি থেকে মুক্তি পান।

বরাহপুরাণে দেখা যায়, ধর্মরাজের বিমাতা ছায়াও একবার ধর্মরাজকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এই যে, যম ও যমুনা সংজ্ঞাদেবীর গর্ভজাত। সংজ্ঞাদেবী স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে তাঁর অনুরূপা ছায়াকে সূর্যের পাশে রেখে বাপের বাড়ি চলে যান।

ছায়া নিজসন্তানদের যে ভাবে যত্ন সহকারে লালন পালন করতেন সতীন সন্তান দুটিকে সে ভাবে আদর যত্ন করতেন না। বিমাতার ব্যবহারে ধর্মরাজ দুঃখ পেয়ে পিতা সূর্যদেবকে অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানান। সতীন পুত্রের এই নালিশে ক্রুদ্ধা ছায়া তাঁকে "প্রেতরাজ হও" বলে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

সূর্যদেব অপত্য স্নেহবশত পুত্রকে বর দেন—"তুমি বিমাতার কথা অনুযায়ী

প্রেতরাজই হবে কিন্তু জীবগণের পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা হয়ে স্বর্গে বাস করবে।"

যমরাজ তথা ধর্মরাজকেও মানব রূপে এই পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বে কথিত বিদুর ছিলেন মানবদেহী এই ধর্মরাজ। মহাভারতের আদি পর্বে বিদুরের জন্ম বৃত্তান্তে দেখা যায় যে রাজা বিচিত্রবীর্য অকালে পরলোকে গমন করলে মাতা সত্যবতী পুত্রবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য ব্যাসদেবকে নিমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ব্যাসদেবের কুৎসিত রূপ-গন্ধবেশভূষা সহ্য করতে না পেরে রমণকালে অম্বিকা চক্ষুদুটি নিমীলিত করে ফেলেন। তাই দেখা যায় এই উৎপাদিত সন্তান জন্মান্ধ হয়।

অম্বিকা পুনরায় ঋতুমতী হলে সত্যবতী আবার তাঁকে ব্যাসদেবের সঙ্গে সঙ্গম করতে বলেন। কিন্তু অম্বিকা কৌশলে তাঁরই এক সুদর্শনা দাসীকে ব্যাসদেবের কাছে প্রেরণ করেন। এই দাসীর পরিচর্যায় ব্যাসদেব অতীব সন্তুষ্ট হন। তখন ব্যাসদেব এই দাসীকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেছিলেন যে তার গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত ধর্মাত্মা এবং পরম বুদ্ধিমান হবে। এই দাসীর গর্ভজাত সন্তানই ছিলেন বিদুর।

এই বিদুরই যে ধর্মরাজ তা মাণ্ডব্যমুনির ঘটনা থেকে জানা যায়। মাণ্ডব্যমুনি ছিলেন মৌনব্রতী সাধু। একবার কয়েকজন তস্কর রাজরক্ষীর ভয়ে তাদের চৌর্য সামগ্রী এই মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখে। রাজরক্ষীরা মুনির আশ্রম থেকে ঐ অপহৃত দ্রব্যগুলি উদ্ধার করে। কিন্তু মুনি মৌনব্রতী থাকার জন্য রক্ষীদের কোন প্রশ্নের উত্তর দেননি। রক্ষীরা চোরের দল সমেত মুনিকেও রাজার কাছে ধরে নিয়ে যায়। রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়ানো হয় কিন্তু মাণ্ডব্যমুনি তাঁর তপস্যার জোরে জীবিত থাকেন। মুনির পরিচয় পেয়ে রাজা তাঁকে শূল থেকে নামিয়ে আনেন এবং নিজের ভুলের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

এদিকে মুনি বেঁচে থাকলেও তাঁর শরীরের মধ্যে ভগ্ন শূলের একটু অংশ থেকে যায়। মাণ্ডব্যমুনি ধর্মরাজের কাছে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে তিনি বাল্যবয়সে একটি পতঙ্গের দেহে একটি তৃণ বিদ্ধ করেছিলেন। এবং সেই পাপের ফলে মুনিকে দেহ মধ্যে শূলখণ্ড বয়ে নিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এই কথা শুনে মাণ্ডব্যমুনি ধর্মরাজের উপর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। কারণ মাণ্ডব্যমুনির সেই সময় বয়স ছিল বার বছরের নিচে এবং এই বয়সের ছেলেদের অন্যায়কে পাপ বলে গ্রহণ করা হয় না। তাই এই অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। অতএব ধর্মরাজ এই মুনিকে অন্যায় করে সাজা দিয়েছেন। তাই ক্রোধদীপ্ত মুনির অভিশাপেই ধর্মরাজকে ব্যাসের ঔরসে দাসীর গর্ভে বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

আতিথেয়তা

ভগবান মনুর বিধান—

'অতিথিঃ নারায়ণঃ।

যঃ তম্ অবজানাতি স নিরয়ং যাতি।।'

অর্থাৎ অতিথিই নারায়ণ। অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করতে হয়। যিনি অতিথিকে উপেক্ষা বা অনাদর করে থাকেন তাকে নরকগামী হতে হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের রীতিই ছিল অতিথি সেবা করা। তাই প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন পুস্তকে অতিথি সেবার ভুরি ভুরি উপাখ্যান পাওয়া যায়। শরণাতীত কাল থেকে দেখা যায় যে অতিথি সেবা আমাদের কৃষ্টির একটি অঙ্গ।

গৃহস্থের নিত্য কর্মের মধ্যে যেমন ভক্তি সহকারে গৃহদেবতাকে পূজা করতে দেখা যায় তেমনি এই নিত্যকর্মের মধ্যেই নিষ্ঠার সঙ্গে অতিথি সেবা করার ঘটনাও বিরল নয়। বিভিন্ন শাস্ত্র এবং ধর্মপুস্তকে আছে, কুল-দেবতার নিত্য সেবা ছাড়াও আদর্শ ধার্মিক গৃহস্থের আরও দুটি নিত্য কর্ম আছে।

প্রথমতঃ অতিথি-সেবা করা, আর দ্বিতীয়তঃ আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান ও আশ্রিতকে সর্বতোভাবে রক্ষা। ঋষি ভিক্ষু ঋগ্বেদে উদাত্তভাবে ঘোষণা করেছেন—

মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ
সত্যম্ ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য।
নার্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং
কেবলাঘো ভবতি কেবলাদো।।

(ঋ ১০/১১৭/৬)

তিনি বেদ মুখে বলেছেন—যে কেবল অন্ন উপায় করে কিন্তু তা দেয় না পাঁচজনের সেবায়, দেয় না বন্ধু-বান্ধব বা অতিথি ভোজে, সে অধার্মিক, সে নির্বোধ। তার অন্নলাভ বৃথা। এমন কৃপণ স্বার্থপর মানুষ মৃতেরই সমান। কারণ, যে কেবল নিজে ভোজন করে সে কেবল পাপই ভক্ষণ করে থাকে।

যজ্ঞের কথা মনে হতেই আমাদের সামনে চিত্রিত হয়ে ওঠে অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ঘটনা। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণের কাছে ঘৃতাহুতি ছাড়াও দীন দুঃখী, অতিথি সেবা এবং পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করাও যজ্ঞ নামে অভিহিত হত।

মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরকে শৌনক মুনি বলেছেন—

সংবিভাগো হি ভূতানাং সর্বেষামেব শস্যতে
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা।।

বিভাগ করে প্রাণিগণকে অন্নদান করা সকল গৃহস্থেরই কর্তব্য। বিভাগ করা বলতে বোঝায়, অন্ন যা পাক করা হবে পোষ্যবর্গের জন্য যেমন তার একটা ভাগ থাকবে, তেমনি গৃহাগত অভুক্ত অতিথির জন্য একটা ভাগ রাখতে হবে। গৃহস্থ অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীকে অন্নদান করবেনই।

দেয়মার্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চা পানীয়ং ক্ষুদিতস্য চ ভোজনম্।।

গৃহে আগত অতিথির প্রয়োজন নানারূপ হতে পারে এবং সেই প্রয়োজন অনুসারে অতিথির সেবা করা গৃহস্থের কর্তব্য। পীড়িত লোকের শয়নের বন্দোবস্ত করতে হবে, পরিশ্রান্তকে আসন দিতে হবে, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানীয় জল দিতে হবে এবং ক্ষুধার্তকে ক্ষুন্নিবৃত্তির খাবার দিতে হবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র শুধু মানুষ অতিথির সম্পর্কে উপদেশ দেয়নি, পশু পক্ষীরাও গৃহে এলে তাদেরও প্রতি কি আচরণ করা উচিত তারও নির্দেশ দিয়েছে। তাই সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে মাটিতে কিছু খাদ্য রেখে দেওয়া প্রতি গৃহস্থের নিত্য কর্তব্য।

চক্ষুর্দদ্যাৎ মনোদদ্যাৎ বাচং দদ্যাৎ চ সুনৃতাম্।
অনুব্রজেৎ উপাসীত স যজ্ঞ পঞ্চদক্ষিণঃ।।

অর্থাৎ অতিথির প্রতি আমাদের উচিত প্রসন্ন নয়নে অবলোকন করা, প্রসন্ন মনে অভ্যর্থনা করা, মধুর ভাবে বাক্যালাপ করা, অতিথির পশ্চাৎ অনুগমন করা এবং বিভিন্ন খাদ্য দ্বারা তার সেবা করা। এইভাবে অতিথিসেবাই পঞ্চবিধ দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ। নিত্য করণীয় বিধির মধ্যে ইহা গৃহস্থের অবশ্য করণীয় বিধি।

আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দান অতিথি সেবার একটি অঙ্গ এবং আশ্রয় প্রার্থীকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পরম বন্ধু ও হিতাকাঙ্খী কিন্তু আশ্রিত দণ্ডিরাজাকে রক্ষা করেছিলেন। ইতিহাসও আমাদের প্রচুর ঘটনা উপহার দিয়েছে। সেখানে দেখা যায় অনেক বীর রাজা আশ্রিতকে আশ্রয় দিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন তবুও আশ্রিতকে রক্ষা করার ধর্ম হতে বিচ্যুত হননি।

মহাভারতের চন্দ্রবংশীয় মহারাজা উশীনরের আশ্রিত কে রক্ষা করার উপাখ্যান সর্বকালের ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে উজ্জ্বলতম। মহারাজা উশীনর নানা যজ্ঞ এবং অনুষ্ঠান করে দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। উশীনরের শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষা করবার জন্য একদিন দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব যথাক্রমে শ্যেন এবং কপোতরূপ ধারণ করে মহারাজের কাছে এলেন। শ্যেন দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোত প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মহারাজ উশীনরের কোলে আশ্রয় নিল। কপোতকে অনুসরণ করে শ্যেনরূপী ইন্দ্র তাঁর ভক্ষ্য কপোতটিকে মুক্ত করে দিতে বললেন। রাজা উশীনর তাঁর উত্তরে বললেন, এই ভীত কপোত নিজের প্রাণরক্ষার জন্যই

আমার কোলে আশ্রয় নিয়েছে তাই এই মৃত্যুভয়ভীত আশ্রিত কপোতকে আমি কখনই শ্যেনের হাতে ছেড়ে দিতে পারব না। মহারাজ উশীনর আরও শাস্ত্রসম্মত যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা এবং শরণাগতকে পরিত্যাগ করা একই ধরনের পাপ। তাই, তিনি কখনই কপোতটিকে ফেরত দেবেন না।

মহারাজের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা শুনে শ্যেনরূপী ইন্দ্র যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে প্রাণীরা বেঁচে থাকে আহার গ্রহণ করার ফলেই। আহারের অভাবে প্রাণীদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই এই শ্যেন যদি খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয় তবে ক্ষুধার জ্বালায় তাঁকে মরতেই হবে এবং ফলে তাঁর পুত্রকলত্রাদিও মারা পড়বে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি কপোতকে রক্ষা করতে গিয়ে মহারাজ অনেকগুলি প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হচ্ছেন। শ্যেন আরও বলে যে ধর্ম অপর ধর্মকে নষ্ট করে সেটা ধর্মই নয়, কুধর্ম। প্রকৃত ধর্ম কখনই অন্য ধর্মের বাধা হয় না। এই শ্যেন পক্ষীর যুক্তি শুনে মহারাজা চমকিত হয়ে উঠলেন এবং শ্যেনকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রচুর বৃষ-বরাহাদি বা অন্য পশুও দান করবার প্রস্তাব দিলেন। শুধু এই আশ্রয়প্রার্থী কপোত ছাড়া আর সবকিছু দেবার আশ্বাস দিলেন।

কিন্তু বাস্তবে শ্যেনপক্ষী তো দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং। তিনি এসেছেন মহারাজ উশীনরের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে। তাই তিনি রাজাকে বললেন যে, রাজা যদি কপোতটিকে প্রকৃতই রক্ষা করতে চান তবে কপোতের সমান ওজনের মাংস তিনি যেন নিজের অঙ্গ থেকে কেটে দেন।

মহারাজ উশীনর এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। কারণ তিনি আশ্রিত কপোতটিকে রক্ষা করতে পারবেন এবং ক্ষুধার্ত শ্যেনপক্ষীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারবেন। মহারাজ তখন তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতটিকে স্থাপন করলেন আর অপর দিকে নিজের মাংস কেটে কপোতের ওজনের অনুরূপ করতে সচেষ্ট হলেন। মহারাজ নিজের শরীরের যত মাংস কেটে তুলাদণ্ডে রাখেন কিছুতেই কপোতরূপী ধর্মের ওজনের সমান হয় না। মহারাজ উশীনর তখন নিজেই তুলাদণ্ডে বসলেন এবং নিজেকে শ্যেনপক্ষীর খাদ্যরূপে উৎসর্গ করলেন।

এই বার শ্যেন ও কপোত নিজ নিজ রূপ ধারণ করে মহারাজ উশীনরের কাছে প্রকট হয়ে বললেন যে তাঁরা এসেছিলেন মহারাজের ধর্মনিষ্ঠা পরীক্ষা করতে। আশ্রিতকে রক্ষা করতে মহারাজের এই ত্যাগ তাঁদের বিমোহিত করেছে। তাঁরা মহারাজ উশীনরকে প্রসন্নচিত্তে আশীর্বাদ করলেন ও তাঁকে সুস্থ দেহ দান করলেন। আর বললেন যে, তাঁর ধর্মনিষ্ঠার গৌরব গাথা যুগে যুগে মানুষের মধ্যে প্রচারিত হবে এবং অন্তে তিনি অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হবেন। সংসারে যে গৃহী আশ্রিতকে এইভাবে আশ্রয় দেবেন এবং তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করবার জন্য যত্নবান হবেন তিনিও মুক্তির অধিকারী হবেন।

নামই সত্য

এক সময় এক প্রতিবেশী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?'

উত্তরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে ভগবানের নাম গুণ কীর্তন করলে দেহের সব পাপ পালিয়ে যায়। দেহ বৃক্ষে পাপ পাখি, আর নামকীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। হাতে তালি দিলে যেমন বৃক্ষের উপর পাখিসব পালায় তেমনি সব পাপ তাঁর নাম গুণ কীর্তনে চলে যায়।

নাম কীর্তনাদি দ্বারা ভগবানের তৃপ্তিবিধান, তাই মানুষের পরম ধর্ম।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে পিতামহ! আপনার বিচারে কোন্ ধর্ম সবশ্রেষ্ঠ?

পিতামহ ভীষ্ম বললেন—

এষ মে সর্বধর্মানাং ধর্মোঽধিকতমা মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চন্নরঃ সদা।।
তমেব চার্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্ স্তবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ।।

কায়মনোবাক্যে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরির পূজা, ধ্যান, গুণকীর্তন ও নমস্কার দ্বারা তাঁর আরাধনা বা তাঁর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই সমস্ত ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

প্রেম প্রবাহ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন, কলহের যুগ এই কলিযুগে মানুষ ভোগবিলাসে আচ্ছন্ন। জ্ঞান যোগ ও কর্মযোগ সাধনায় ঈশ্বর প্রাপ্তি—সে বড় কঠিন, তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজেই ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

পদ্মাপুরাণে মহাদেব পার্বতীকে বলছেন—

রাম রামেতি রামেতি রমে! রামে! মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে।।

হে সুন্দরী বরাননে, হে মনোরমে, তুমি রাম এই নাম শ্রবণ করো। কেননা অন্য সহস্র নামের সমান এক রামনাম।

'রামচরিতমানসে' তুলসীদাসজী যথার্থ কথাই বলে গেছেন—

সংসারাময় ভেষজং
সুমধুরং শ্রীজানকীজীবনম।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি
সততং শ্রীরামনামামৃতম।।

তিনি বলেছেন, সংসার রোগে একমাত্র নিরাময়কারী ভেষজ হল রাম নাম—পরম সুখকর এবং আনন্দপ্রদ। যাঁরা সতত রামনামের অমৃত পান করতে পারেন মনুষ্যসমাজে তাঁরা ধন্য। আর কৃষ্ণনাম? কৃ আর ষ্ণ-ই হচ্ছে সর্বোত্তম অক্ষর। সর্বোত্তম নামই কৃষ্ণ।

"এক' কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ'।

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা)

পাপমুক্ত না হলে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা যায় না। সে সম্বন্ধে গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মনাম্
তে দ্বন্দমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ

(গীতা ৭।২৮)

যে সমস্ত মানুষ পূর্বজন্মে ও এইজন্মে পুণ্যকর্ম্ম করেছে, যারা সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছে এবং যারা দ্বন্দ্ব ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে তারাই নিষ্ঠা সহকারে আমার সেবায় যুক্ত হয় এবং যে মানুষ সর্বতোভাবে পাপমুক্ত হয়েছে সে দ্বন্দ্ব মোহ মুক্ত হয়ে অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ হতে পারে!

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বলা হয়েছে—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাতু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যাতু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।।

অর্থাৎ পবিত্র সহস্র নামের তিনবার পাঠে যে ফল হয়, কৃষ্ণ এই একটি নামের একবার মাত্র পাঠে সেই ফল পাওয়া যায়।

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
মূঢ় মতে।"

এই শ্লোকাংশটি শ্রীশঙ্করাচার্যের 'চর্পটা পঞ্জরিকা স্ত্রোত্রে'র মধ্যে পাই। শ্রীশঙ্করাচার্য প্রচারিত ভক্তি মাহাত্ম্য স্তবের মধ্যে এই শ্লোকাংশটি নিঃসন্দেহে মহামূল্যবান।

'হরি' এই নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর প্রকৃত শক্তির অন্তর্নিহিত অর্থটি। হরি কে? যিনি হরণ করেন তিনিই হরি। তিনি কি হরণ করেন? তিনি হরণ করেন আমাদের দুঃখ, কষ্ট, তাপ-অনুতাপ, আর কাদের এইগুলি হরণ করেন? যারা হরি

হরি বলে তাঁর শরণাপন্ন হয়। শুধু হরিনাম বলা বন্ধ করার জন্যই হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে মহাসর্পদ্বারা দংশন করালেন, গিরিশৃঙ্গ হতে অধঃপতিত করে, ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ প্রদান করে অবশেষে তাঁকে ফেলে ছিলেন মত্ত হাতির পায়ের নীচে তাঁকে পিষ্ট করার জন্য। নিঃসহায় ঐটুকু বালক, মুখে তাঁর হরিনাম। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মত্তহাতী, পাদপিষ্ট হল না মানব শিশুর দেহটি।

ধেয়ে আসে মত্তকরী
প্রহ্লাদ বলে হরি হরি।
দাঁড়ায় থেকে স্থানুবৎ
পর্ব্বত সম ঐরাবত।।
হরিনামের কি অপার মহিমা।

শুধু এই ঘটনাগুলিই নয়, আমাদের মানস মুকুরে ভেসে ওঠে ভক্ত প্রহ্লাদের সেই অত্যাচার জর্জরিত মুখচ্ছবি। যাঁর মধ্যে নেই কোনো কষ্টের চিহ্ন।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়া পহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।।

(গীতা ৭/১৫)

যারা মূর্খ, যারা নরাধম, যাদের জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীরা কখনও আমার শরণাপন্ন হয় না।

বালক প্রহলাদের পিতা হচ্ছেন 'আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ অর্থাৎ আসুরিক ভাবাপন্ন, তিনি ভগবানের রূপে বিশ্বাস করেন না, ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন।

হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে বলছেন, "তুই মন্দবুদ্ধি, তুই কুলক্ষয়কারী অধম, তুই নাম কীর্ত্তন করে গর্বিত হয়ে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বলেছিস আমি ছাড়া আর এক জগদীশ্বর আছে। যদি থাকে সে কোথায়? যদি বলিস সে সর্বত্র আছে, তবে এই স্তম্ভে তাঁকে দেখছি না কেন?"

প্রহলাদ সহাস্য আননে নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন যে তাঁর হরি ঐ নিরেট প্রস্তরস্তম্ভের মধ্যেই আছেন।

এই কথায় হিরণ্যকশিপুর অবজ্ঞাভরা উচ্চ হাস্যে কেঁপে উঠল সভাস্থল।

ভক্তের বিশ্বাসকে সফল করতে আর আসুরিক শক্তিকে দমন করতে বৈকুণ্ঠে স্বয়ং বিষ্ণু হলেন চঞ্চল। তাই হিরণ্যকশিপুর অট্টহাস্যের অনুরণনকে ছাপিয়ে শুরু হল প্রস্তরস্তম্ভ ভেঙে পড়ার বজ্রনিনাদ। আর তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো একটি অদ্ভুত জীব—অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক সিংহ, এক নৃসিংহমূর্তি। বিকট গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলো সেই মূর্তি আর প্রবল আকর্ষণে হিরণ্যকশিপুকে জানুদেশের

উপর স্থাপন করে তীক্ষ্ণনখের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল হিরণ্যকশিপুর বিরাট বপু। রক্তের স্রোত বইল সভাগৃহে—এক আসুরিক শক্তির হল বিনাশ আর প্রমাণ হল ভক্তের আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেন না শ্রীহরি।

ভগবানের নাম কীর্ত্তনে যে কত মধু আছে, কত আনন্দ আছে তা ভক্ত প্রহলাদ সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন।

যাগ নেই, যজ্ঞ নেই, মন্ত্র নেই, স্তোত্র নেই, নদীয়ার অতবড় বেদান্ত পণ্ডিত পথে পথে ঘোরেন, তাঁর দুই চোখে বইছে জলের ধারা, মুখে শুধু বাণী "হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ।" তাই দেখে কাশীর কোন কোন সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সমালোচনা করে বলেছেন—

সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন-নাচন।
না করে বেদান্ত পাঠ করে সংকীর্তন।।
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ ধর্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফিরে ভাবুকের সনে।।

(চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা)

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবন পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই মহাপ্রভুর কৃপায় এ জগতে অনেক ঘোর পাপী বা তমসাচ্ছন্ন ব্যক্তি পূর্ব কলুষিত জীবন থেকে উদ্ধার পেয়েছে। যেমন ভোরের সোনাঝরা রোদ্দুর নিমেষের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারকে দূরীভূত করে বিশ্বচরাচরকে আলোর বন্যায় স্নান করিয়ে দেয় তেমনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় মুহূর্তের মধ্যে পাপী-তাপী উদ্ধার পায়।

নারদীয় ভক্তি সূত্রেও এই একই কথা—কলিতে নামই একমাত্র সহায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন যে ভক্তি বা শ্রদ্ধাবিবর্জিত মানুষ যদি অতি অবহেলা ভরেও ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তার নাম'ও ভগবানের হৃদয়ে গাঁথা থাকে।

'শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ।
তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ততে মম হৃদয়ে।'

চিদাত্মক হরিনাম একবার মাত্র উচ্চারণ করলে যে ফল হয় তা সহস্রবদন অনন্তও বর্ণনা করতে পারে না। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি, দ্বাপর ছাড়িয়ে কলিযুগেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নদের নিমাইয়ের হরিনাম বন্ধ করার জন্য কাজী হুকুম জারি করে 'আজ থেকে প্রকাশ্যে কেউ হরিনাম করবে না।' হরিনাম বন্ধ করার জন্য হুকুমনামা দিতে গিয়ে কাজীকে 'হরি' কথাটি উচ্চারণ করতে হয়েছিল, তার ফলেই কাজী উদ্ধার পায় এবং হরিভক্ত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন যুগে ভগবৎ প্রাপ্তির পন্থাও বিভিন্ন। যেমন সত্য যুগে ঈশ্বর আরাধনায় ধ্যানই প্রধান মাধ্যম বলে বিবেচিত হত। আর ত্রেতা যুগে দেখা গেল যাগ-যজ্ঞের বিরাট বিরাট আয়োজন। আবার দ্বাপরে শুধু প্রেম দিয়ে, সেবা দিয়ে ভগবানের পাদপদ্মে স্থান পাওয়া যেত। কিন্তু আমাদের এই কলি যুগে শুধু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন করেই অন্য যুগের মতই অভীষ্ট ফলটি পাওয়া যায়।

এ যুগের পরম সাধক ঠাকুর হরিদাস শুধু নাম সংকীর্তন করার ফলেই অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা উৎরে পরম প্রাপ্তি লাভ করেছিলেন। আর শুধু নামকীর্তনের বলেই তিনি মুলুকপতির অত্যাচারকে অবহেলা ক্রমে অতিক্রম করেছিলেন।

মুলুকপতি ঠাকুর হরিদাসকে হরিনাম ছেড়ে আল্লা-আল্লা বলতে হুকুম করে। কিন্তু হরিদাস বলেন,

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম।।

যবন রাজার যবন পাইকরা একের পর এক বাজারে নিয়ে গিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে বেত মারছে। যত মারছে তত কৃষ্ণ কৃষ্ণ-হরি হরি বলছেন হরিদাস। এত প্রহার তবু ব্যথা পাননি, প্রাণ যায়নি হরিদাসের যেমন যায়নি প্রহ্লাদের। সমস্ত অত্যাচার আঘাত ব্যর্থ হয়েছে।

আবার ফুলিয়াতে অবস্থান কালে তিনি নিজ গোফায় উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন করেছিলেন তখন এক ব্রাহ্মণ ক্রুব্ধ হয়ে তাঁকে বললে, "হরিনাম চেঁচিয়ে বলতে হবে এ কার শিক্ষা?"

হরিদাস সবিনয়ে বললেন যে, তিনি শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নামকীর্তন করেছেন। তিনি বলেন যে, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করলে শতগুণ ফল হয়। যে বলে সে তো তরেই, যে শোনে সেও তরে। এমনকি পশু-পাখী কীটপতঙ্গও ত্রাণ পায়।

শুধু তাই নয় অতীব প্রলোভনের মধ্যেও শুধুই কৃষ্ণনামের প্রভাবে তাঁর চারিত্রিক স্খলনও হয়নি।

ঠাকুর হরিদাস শান্তিপুরে গঙ্গার তীরে নির্জন গোফায় নামকীর্তন করছিলেন তখন তাঁর একাগ্রতার গভীরতা পরীক্ষা করার জন্য মায়া দেবী সেখানে হাজির হলেন। তাঁর চরিত্র স্খলনের জন্য মায়াদেবী রূপ ধরেছেন এক উদ্ভিন্ন যৌবনবতী রূপসীর। স্বল্পবাসে আবৃতা হয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে দিয়েছেন কামরস আপ্লুত যৌবনের মধুভাণ্ড। হাস্যে-লাস্যে বিলোল কটাক্ষে উত্তেজিত করতে চেয়েছেন ঠাকুর হরিদাসকে। কিন্তু মদনের শর সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে হরিনামে বিভোর এই হরিদাসের কাছে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—

'যারা আমার শরণাগত তারা মায়াশক্তির দ্বারা পরাভূত হয় না।'

মায়াদেবী স্বয়ং ঠাকুর হরিদাসকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কেননা হরিদাসকে তিনি মোহিত করতে পারেননি। মায়াদেবী বুঝতে পারলেন, কৃষ্ণনামের প্রভাবেই ঠাকুর হরিদাস এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছেন। তাই পরাজিত মায়াদেবী স্বয়ং হরিদাসের কাছে প্রার্থনা করলেন সেই সর্বজয়ী কৃষ্ণনাম করার শক্তি। তিনি চেয়েছিলেন ঠাকুর হরিদাস তাঁকে এমন শক্তি দিন যাতে তিনি প্রেমসিক্তকৃষ্ণ নামে অবগাহন করে নিজেকে ধন্যা করতে পারেন।

ভক্তিতত্ত্ববিচারে নামকীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছে। কেননা ভক্তিমার্গে নামরূপেরই সাধনা। সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রই সমস্বরে নামমাহাত্ম্যকীর্তন করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্দে বলা হয়েছে—

কলের্দোষনিধেঃ রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।

এই কলি যুগ পাপে পূর্ণ এবং সেই জন্যই মানুষ নানাভাবে দুর্দশাগ্রস্ত, কিন্তু তবুও এই যুগের একটি মহৎ গুণ যে কলিতে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই সংসার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পরমাগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নারদ পঞ্চরাত্রে "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে—

ত্রয়ো বেদাঃ ষড়াঙ্গানি ছন্দাংসি বিবিধাঃ সুরাঃ।

সর্বম অষ্টাক্ষরান্তঃ স্থঃ যচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম।

সর্ব-বেদান্ত-সারার্থঃ সংসারার্ণব তারণ।।

অর্থাৎ তিন প্রকার বৈদিক ক্রিয়া (কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ড), ছন্দ বা বৈদিক মন্ত্র এবং দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার পন্থা—এ সবই "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" এই আটটি অক্ষরে নিহিত রয়েছে। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম। এটিই হচ্ছে সমস্ত বেদান্তের চরম তত্ত্ব। ভব সাগর পার হওয়ার একমাত্র পন্থা হচ্ছে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করা। তেমনি আবার কলিসন্তরণ উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে—

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।।

—বত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই ষোলটি নাম কলিযুগের সমস্ত কলুষ বিনষ্ট করার একমাত্র উপায়।

রামায়ণে আমরা দেখতে পাই ভক্ত হনুমানের কাছে রাম নামই ছিল পরম সহায়। 'শ্রীরাম' এই নাম স্মরণ করে তিনি একলাফে দুস্তর সমুদ্র অতিক্রম করে

লঙ্কার ভূমি স্পর্শ করেন। সমুদ্র অতিক্রম করার জন্য হনুমানকে যানবাহন বা সেতুর সাহায্য নিতে হয় নি।

সেবার বলরামবাবুর বাড়িতে রথোৎসবের আয়োজন হয়েছে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ভক্তজন সহ এই উৎসবে যোগদান করতে এসেছেন। বিরাট বারান্দা। এই বারান্দাতেই স্থাপন করা হয়েছে রথটিকে।

'নদে টলমল করে, গৌর প্রেমের হিল্লোরে'—

ঠাকুরের কণ্ঠে এই গান, আবার ভক্তজনও মিশিয়েছে কণ্ঠ। ঠাকুরের দুই চোখে ঝরছে প্রেমের অশ্রুধারা। কখনও টানছেন রথ আর কখনও বা নেচে নেচে গাইছেন—

'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে
তারা দুভাই এসেছে রে।'

(কথামৃত ৪র্থ ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড, পঞ্চম পরিঃ)

তদানীন্তনকালে ভক্ত সমাগমে ঠাকুরের কীর্তন ও নৃত্যের অথবা নৃত্য সহযোগে কীর্তনের বহু সংবাদ পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—"ভগবৎ ভজন পরায়ণ ব্যক্তিগণ তাঁদের প্রিয় সেই শ্রীহরির নাম যখন কীর্তন করতে থাকেন তখন অনুরাগের আবির্ভাবে তাঁদের চিত্ত দ্রবীভূত হয়।

সাধারণ ভক্তের জন্য নামকীর্তন ও ভক্তিমার্গই কলিকালে প্রশস্ত।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরম ব্রহ্ম

কেনোপনিষদের প্রসিদ্ধ কাহিনীতে আছে, পরম বিক্রমশালী অসুরদের যুদ্ধে পরাজিত করে দেবতারা যৎপরোনাস্তি আত্মম্ভরিতায় গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠলেন। ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ মনে করলেন যে নিজেদের বীর্যবত্তার ফলেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কিন্তু দেবতাদের এই আত্মপ্রসাদ বা অহংবোধ একেবারেই অন্তঃসারশূন্য। দেবতাগণকে প্রকৃত সত্যটি অনুধাবন করানোর জন্য সর্বশক্তির আকর পরম ব্রহ্ম নিজ যোগপ্রভাবে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আপন অহমিকায় দেবতারা এতই অন্ধ ছিলেন যে সেই ব্রহ্মরূপ দেখেও পরম ব্রহ্মের শক্তির প্রভাব বুঝতে অপারগ হলেন। এখন পরম ব্রহ্মের প্রকৃত রূপটি কি?

পরম ব্রহ্ম সব কিছুর উর্ধ্বে হলেও সব কিছুর মধ্যেই তাঁর উপস্থিতি। তিনি যেমন একদিকে পালন করেন তেমনি অপরদিকে ধ্বংসও করেন। আর এই ধ্বংসের মধ্যেই নিহিত থাকে তাঁর সৃষ্টির বীজটি। অর্থাৎ এক দিকে যেমন তিনি রুদ্ররূপী সংহারক অপর দিকে তেমনি তিনি কল্যাণময় সৃষ্টিকর্তা।

ভাগবতের 'ব্রহ্মামোহন লীলায়' দেখা যায় স্বয়ং ব্রহ্মা পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে বুঝতে অসমর্থ হয়েছিলেন। একদা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গোপ সখাদের সঙ্গে বনভোজনের আনন্দ উৎসবকালে উচ্ছিষ্ট গ্রহণে বাদ-বিচার করছিলেন না। পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই মানবসুলভ আচরণের দর্শনে ব্রহ্মার মনে পরম ব্রহ্মের সম্বন্ধে একটু সন্দেহের কারণ ঘটে। তখন ব্রহ্মা কৌশলে এক বছর গোবৎস এবং গোপসখাগণকে হরণ করে লুকিয়ে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই কৌশল অনুধাবন করে নিজেই গোপবালক ও গোবৎসের রূপধারণ করে যথারীতি সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই কৌশল গ্রহণে বৃন্দাবনের মানুষজনেরা ব্রহ্মার অপকীর্ত্তির বেড়িপাশ হতে মুক্ত রইল। বৎসরান্তে ব্রহ্মা দেখলেন যে তাঁর কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। গোবৎস ও গোপসখাগণ যথারীতি শ্রীকৃষ্ণেরই সঙ্গে রয়েছে। ব্রহ্মা কর্তৃক অপহৃত বামালগুলি ব্রহ্মার রক্ষিত স্থানেই রয়েছে। ব্রহ্মা তখন শ্রীকৃষ্ণ তথা পরম ব্রহ্মের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন,—

পশ্যেশ, মেহনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ।।
অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত! মে রজোভুবো হ্যজানতস্তৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি।।

(ভাগবত, ব্রহ্মাস্তুতি, ১০/১৪/৯-১০)

হে পরমেশ্বর! আমার দুর্বুদ্ধি তুমি অবলোকন কর। তুমি মায়াবীগণকেও মায়ায় অভিভূত করতে পার, তুমি মায়া অধিপতি, তুমি সব কাজেরই নিয়ন্তা। মূর্খ আমি তোমার উপর মায়া বিস্তার করে নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। অগ্নির নিকট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অতি নগণ্য, আমিও তেমনি তোমার নিকট অতি নগণ্য। হে অচ্যুত! আমি জন্মগ্রহণ করেছি তোমার রজোগুণ থেকে। কিন্তু আমি নিতান্ত অন্ধ এবং অজ্ঞ। অহং বোধে আমি তোমা হতে নিজেকে পৃথক্ ভেবে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিলাম। হে প্রভু! তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর। তুমি মনে কর যে "এই ব্রহ্মা আমারই ভৃত্য বিশেষ, তাই আমার কৃপার পাত্র।"

আবার যিনি জীবকুলকে মায়ার বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে মা যশোদা মনে করেছেন আত্মজ অর্থাৎ নিজের পেটের ছেলে। তিনি জানতেন না যে তাঁর সেই শিশুপুত্রটি আদি অন্তহীন, তাঁর অন্তর বাহির নেই অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপক। তিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। তিনি সমস্ত জগৎস্বরূপ। মা যশোদা তাঁকে একটি সাধারণ বালকের মত শাসন করে দড়ি দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। একের পর এক দড়ি যোগান দিয়েও মা যশোদা সেদিন দুষ্ট গোপালকে বাঁধতে পারেন নি। প্রতি বারই অবাক্ হয়ে দেখেন যে দড়িটি দুই আঙুল কম হচ্ছে। অথচ দড়ির সংখ্যা বাড়ছে, দৈর্ঘ্য বাড়ছে, অথচ দুই আঙ্গুল কমের জন্য গোপালকে বাঁধা যাচ্ছে না। দুই আঙ্গুল — অহং আর মম। অহং আর মম এই দুইটি বোধই পরম ব্রহ্ম বোধের অন্তরায়।

বিজয়ী দেবতাগণ আত্মগরিমায় অহং বোধের বশীভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণে অসমর্থ দেবতাগণ যুদ্ধ বিজয়ের উৎসবে আস্ফালন সহকারে যোগদান করেছিলেন। উৎসবের প্রাক্মুহূর্তে তাঁরা দেখলেন যে এক পরম জ্যোতিতে সকল দিক্ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ জ্যোতি অবর্ণনীয়,—ভারী আশ্চর্য জ্যোতিঃ। দেবতারা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন — কে এই অজানা অজ্ঞেয় পুরুষ যাঁর এমন জ্যোতি? দেবতারা তখন সেই পরমপুরুষকে জানার জন্য অগ্নিকে পাঠালেন। মহাশক্তিশালী আত্মগর্বী অগ্নি জ্যোতির্ময়ের সামনে এসে হাজির হলেন। তখন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ অগ্নিকে তাঁর পরিচয় এবং ক্ষমতা জানাতে বললেন। অগ্নি সগর্বে উত্তর দিলেন, "আমি অগ্নি এবং জাতবেদা, এই পৃথিবীর সব কিছুই আমি দগ্ধ করতে পারি।" তখন সেই পুরুষ

অগ্নির সামনে একটি তৃণ রেখে পোড়াতে বললেন। অগ্নি এটিকে খুব সহজ কাজ মনে করে অবহেলা ভাবে তৃণটিকে পোড়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে নিজের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেও পুনরায় ব্যর্থ হলেন। অগ্নি তখন লজ্জায় সেই স্থান পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু পুরুষটির পরিচয় তাঁর জানা হল না। অতঃপর দেবতারা বায়ুর উপর ঐ পুরুষের পরিচয় জানার ভার দিলেন। বলদর্পী বায়ু পুরুষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি তৃণখণ্ডকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হলেন। পরাজিত ও লজ্জিত বায়ুর পক্ষেও এই পুরুষের পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

ব্যর্থকাম বায়ুকে দেখে দেবতারা তখন ইন্দ্রের উপর ঐ পুরুষের পরিচয় জানার ভার অর্পণ করলেন। ইন্দ্র সেই অজানা অজ্ঞেয় পুরুষের নিকট গমন করলেন। এদিকে ব্রহ্মও অন্তর্হিত হলেন ইন্দ্র এবং সকল দেবতাগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য। অগ্নি বা বায়ুর মত ইন্দ্র ফিরে গেলেন না। এই পরমপুরুষের স্বরূপ জানার জন্য ধ্যানমগ্ন হলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের স্বরূপ জানার জন্য অহংকার শূন্য একাগ্র তপস্যারই প্রয়োজন। ইন্দ্রের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে আবির্ভূত হলেন মণিমুক্তাখচিত দুর্লভ অলঙ্কার শোভিতা এক নারীমূর্তি। তাঁর অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে সমগ্র দিক্‌মণ্ডল। ব্রহ্ম অন্তর্হিত হলেন আবির্ভূতা হলেন ব্রহ্মময়ী, মহাশক্তি। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন অভেদ তেমনি ব্রহ্ম ও তার শক্তি অভেদ।

দেবীর আনন্দোজ্জ্বল বরাভয় মূর্তি দর্শন করে ইন্দ্র বুঝলেন ইনিই উমা হৈমবতী। তাঁকে কৃপা করতেই উমা হৈমবতীর আগমন। ইন্দ্রের আজ রাজদর্প, দেবদর্প ও অহংকার সবই চলে গেছে। এখন তিনি বিনীত ভাবে জানতে উৎসুক সেই পরমপুরুষকে। তাই ইন্দ্র ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলেন দেবী উমাকে, "যিনি এইমাত্র দেখা দিয়ে অন্তর্হিত হলেন, সেই পরমপুরুষ কে?"

উত্তরে দেবী বললেন, "ইনি ব্রহ্ম। তোমরা যে ক্ষমতার অহংকার কর তা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। এই ব্রহ্মই সমস্ত কার্যের কর্তা। তাই তোমাদের বিজয়ের দামামা আর গর্বের ফানুস ব্রহ্মের সাহায্য ছাড়া নিমেষে ফেটে চুপসে যায়।" এই কথা শুনে ব্রহ্ম সম্পর্কে ইন্দ্রের সম্যক্ জ্ঞানের উপলব্ধি হলো।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য সেখানে ছিল আরব্ধ ঘটনার সম্ভাব্য ফলাফলকে কেন্দ্র করে। এখানে অর্জুন তাঁর প্রতিপক্ষ হিসাবে আত্মীয়স্বজনদের দেখে গাণ্ডীব ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পার্থের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধে এই সমস্ত আত্মীয়স্বজনদের হত্যাকারী হিসাবে পাপের ফলভোগ করবেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বতত্ত্বের মূল কথা বুঝিয়ে ও নিজস্ব স্বরূপ প্রকট করে বোঝালেন যে, এই সমস্ত কর্মাকর্মের জন্য তিনি মোটেই দায়ী নন, নিমিত্ত মাত্র। তাই হত্যাজনিত পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। এতেই প্রমাণিত হয়

মানুষ এমন কি দেবতারাও কোন কর্মের নিয়ন্তা নয়। বিজয়ীর গৌরবমত্ততা ও পরাজয়ের হীনম্মন্যতা সবই নিরর্থক। পরম ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হাতে সকলেই ক্রীড়নক মাত্র।

যে কথা দেবকুলে প্রযোজ্য সে কথা মনুষ্যকুলেও প্রযোজ্য। তাঁর শক্তিতেই আমাদের দেহযন্ত্র চালিত হচ্ছে, তিনিই হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে যন্ত্রী যেমন যন্ত্রকে চালিত করেন তেমনই আমাদের পরিচালিত করছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।।

(গীতা, ১৮/৬১)

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ব্রহ্ম। আর এই ব্রহ্মই সমস্ত বিশ্বের পালন কর্তা।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চা সর্বদা।।

(শ্রী শ্রী চণ্ডী, ১/৭৫)

মহাশক্তি যেমন সৃষ্টি স্থিতি লয়কারিণী আবার তিনি মাতৃরূপা কল্যাণময়ী, অভয়বরদাত্রী। তিনি প্রার্থনা অনুযায়ী সদাই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রী শ্রী চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য উভয়ে মেধামুনির উপদেশে তিন বছর সমাহিত চিত্তে মহাশক্তির আরাধনা করে মহাদেবীর কৃপা লাভ করেছিলেন। জগন্মাতা ভক্তদ্বয়ের আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূতা হলেন এবং উভয় ভক্তকে স্ব-স্ব অভিলাষানুরূপ বর প্রদানপূর্বক আশীর্বাদ করলেন,

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্।
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি।
বৈশ্যবর্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তৎ প্রযচ্ছামি সং সিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি।।

(দেবী মাহাত্ম্য, ১৩/২০-২১, ২৪-২৫)

চণ্ডীদেবী বললেন, "হে রাজন্! অল্প দিনের মধ্যেই তুমি শত্রু নাশ করে নিজ রাজ্য পুনরায় লাভ করবে। তোমার সেই রাজ্যের আর বিচ্যুতি হবে না।"

দেবী বৈশ্যকে বললেন, "হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ, তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করেছ তা তোমাকে প্রদান করছি। তোমার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে।"

প্রকৃতপক্ষে মহাশক্তি মহামায়ার কৃপায় সকলের জীবন হয় ধন্য। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জগন্মাতার কৃপাতেই আমাদের পথপ্রদর্শক ও পরমারাধ্য হয়েছেন এবং তাঁরা মানবদেহ ধারণ করেও দেবপদবাচ্য হয়েছেন।

শিব ও শিবলিঙ্গ

শিব পরমাত্মা বা ব্রহ্মেরই নামান্তর। তিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং। শিবই বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং তিনি বিশ্বদেব, বিশ্বরূপ। বিশ্বান্তর্যামী। শিব পুরাণে মহাদেবের উক্তি—

অহং শিবঃ শিবশ্চাহং ত্বঞ্চাপি শিব এব চ।
সর্বং শিবময়ং ব্রহ্মন্ শিবাৎ পরং ন কিঞ্চন।।

অর্থাৎ আমি শিব, তুমিও শিব, সমস্তই শিবময়। শিব ভিন্ন অপর কিছুই নাই।

তিনি নিজের সেবকদের প্রতিহিংসা করেন না এবং তাঁর ক্রোধ না হলেই প্রজাদের মঙ্গল। এই জন্যই তিনি শিব। ভরত বলেছেন—

শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য শিবঃ নশ্যতি অশুভ মিতিবা।
শেরতেঽবতিষ্ঠন্তে অনিমাদয়োঽষ্টোগুণা অস্মিন্
ইতি বা শিবঃ।।

—সমস্ত কল্যাণ যাঁহাতে বিদ্যমান, সমস্ত অশুভ যিনি দূর করেন এবং যিনি অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের আধার তিনিই শিব।

কৈলাস পর্বতের শৃঙ্গে তাঁর বাস, মেরু পর্বত তাঁর ধনু, সর্পরাজ তাঁর ধনুর গুণ, বিষ্ণুর বদন তাঁর শর, তিনি নিমেষ মাত্র ত্রিপুর দগ্ধ করেছিলেন এবং দেবতাদের দ্বারা তিনি বন্দিত। তাই আমাদের পুরাণগুলিতে শিবসুন্দরের চরিত্র বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এমন আর কোন দেবতার হয়নি। দেবতাদের সমস্ত বল ও মানুষের সমস্ত দুর্বলতা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। পাপী তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে, তাপী তাঁর করুণা পেয়েছে। বরদানের ব্যাপারে তিনি একেবারেই দিলদরিয়া। সমস্তই তাঁর মর্জি মেজাজের উপর নির্ভর করেছে। পাত্রাপাত্র তিনি কখনও বিচার করেন নি। তাঁর রুচিতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা আর কোন দেবতার নেই।

একবার ব্রহ্মার মনে আত্মাভিমান জেগেছিল যে তিনি জগদ্‌যোনি, লোক-পিতামহ, ত্রিজগতে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। ব্রহ্মার এই মনের ভাব দেখে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 'ক্রতু' ব্রহ্মাকে উপহাস করে বলেছিলেন—'পরমতত্ত্ব না জেনে তুমি একি প্রলাপ বকছ। আমিই জগৎ ও জীবের কর্তা। যজ্ঞস্বরূপ এবং পরম জ্যোতিস্বরূপ, এই ভাবে দুই দেবতার দ্বন্দ্ব যখন চরমে, তখন চারিবেদ তাঁদের

সামনে প্রকট হয়ে যা বলেছিলেন—

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।

যদাহস্থৎপরং তত্ত্বং স রুদ্রাস্ত্বেক এবহি।।

(কাশীখণ্ডম্ ৩১ অধ্যায়)

ঋগবেদ বললেন—ভূতগণ যাঁর অন্তরে অবস্থিত, যা হতে সমস্ত উৎপন্ন এবং মহাত্মাগণ যাঁকে পরম শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন, সেই রুদ্রই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

যজুরোবাচ—

যো যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেন চ সমিজ্যতে।

যেন প্রমাণং হি বয়ং স একঃ সর্বদৃক্ শিবঃ।।

যর্জুবেদ বললেন—যে ঈশ্বর যজ্ঞসমূহ এবং যোগের দ্বারা পূজিত হন এবং যাঁর প্রভাবে বেদ সকল প্রমাণরূপে ত্রিলোকে পরিগৃহীত, সেই সর্বদর্শী শিবই একমাত্র পরমতত্ত্ব।

সামোবচ—

যেনেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভির্যো বিচিন্ত্যতে।

যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং স একস্ত্র্যম্বকঃ পরঃ।।

সামবেদ বললেন—যিনি এই বিশ্বকে ভ্রমণ করাচ্ছেন, যিনি যোগীগণের দ্বারা বিচিন্তিত এবং যাঁর দীপ্তিতে বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, সেই একমাত্র ত্রম্বকই পরম তত্ত্ব।

অথর্বোবাচ—

যং প্রপশ্যন্তি দেবেশং ভক্তানুগ্রহিনো জনাঃ

তমাহরেকং কৈবল্যং শঙ্করং দুঃখতস্করম্।।

অথর্ববেদ বললেন— কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ যে দেবেশকে দর্শন করে থাকেন সেই কৈবল্যস্বরূপ দুঃখহারী শঙ্করকেই মহাত্মাগণ একমাত্র পরমতত্ত্ব বলে কীর্তন করে থাকেন।

এই মন্ত্রে একটা শব্দ আছে—'দুঃখতস্করম্' তস্কর অর্থে চোর। চোর মানুষের পার্থিব সম্পদ টাকা, সোনা, রূপা, হীরা, জহরৎ ইত্যাদি অপহরণ করে, কিন্তু শিব সুন্দর হরণ করেন মানুষের দুঃখ-কষ্ট, আধি এবং ব্যাধি। তাই তো অনাদি কাল হতে শিবসুন্দর আমাদের আরাধ্য।

বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারত তথা বর্হিভারতেও এই শিবসুন্দরের শত শত রকমের মূর্তি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের দ্বারা পূজিত হলেও শিব পূজার বিশ্ব ব্যাপকতা বা জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হয়েছে, শিবের লিঙ্গ প্রতীক পূজার মাধ্যমে।

এই শিবলিঙ্গের অর্থ কি? লিঙ্গ শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। বাহ্যত শিবলিঙ্গ

তো একখণ্ড নুড়ি বা পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। এই শিবের লিঙ্গ প্রতীকও দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারের। আধুনিক কালের শিবলিঙ্গগুলির অধিকাংশই গৌরীপট্ট যুক্ত (যোনি প্রতীক)। শিব ছাড়া শক্তির উপস্থিতি অসম্ভব আবার শক্তি ছাড়া শিব অর্থহীন। শিবের প্রকাশ তাই শিবের পূর্ণ প্রতীক গৌরীপট্ট বা শক্তি প্রতীক যুক্ত। গৌরীপট্ট যুক্ত লিঙ্গ বা প্রতীক সর্বসাধারণের কাছে হয়ে উঠল জনপ্রিয়।

মধ্যযুগের শিবলিঙ্গগুলির মধ্যে অনেকগুলির উপর দিকে পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুণ্ড বসান, কোনটি বা চতুর্মুখ। কোন কোন শিবলিঙ্গের গায়ে মুখ-গহ্বর, চোখ ও নাক খোদাই করা আছে।

শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে এবং শাস্ত্রে বহু বৈচিত্র্যময় বর্ণনা আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বিচিত্র শিব চিহ্ন যুক্ত ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় মহামুনি বলেছেন—

গর্ভেতব বসিস্যামি পুত্রো ভূত্বা শিবাত্মজা।
মম ত্বম্ অপরামূর্তি খ্যাতা জলময়ী শিবা।।
অপরং বরং দাস্যামি পশ্য দেবি মহৎতেজা।
লিঙ্গরূপেণ সুচিরং প্লবয়ামি তব ক্রোড়ে।।

—শিব তাঁর পুত্রী মা নর্মদাকে বর দিয়েছিলেন,— আমি তোমার পুত্র হয়ে তোমার গর্ভে (জলেই) বাস করব। তুমি আমার অপরা মূর্তিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। তোমাকে আমি আরও একটি বরদান করছি—আমি লিঙ্গরূপে চিরকাল তোমার কোলে ভেসে বেড়াব।

স্বয়ং মহেশ্বর দেবীকে বলেছিলেন—
প্রশস্ত নার্মদং লিঙ্গং পক্ক জম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণ তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্।।
হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংশ্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্মদাজলে।।
পুরা বানাসুরেনাহং প্রার্থিতো নর্মদাতটে।
অবিবশং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বর।।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতিমতোঽর্থাজ্জগতী তলে।
অন্যেষং কোটি লিঙ্গানাং পূজনে যৎফলং লভেৎ।।
তৎফলং লভতে মর্ত্যো বাণলিঙ্গক পূজনাৎ।

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

বাণাসুরের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিয়েছিলাম যে, পর্বত ও নর্মদা জলের বিঘূর্ণন ও বিঘর্ষণে আমি লিঙ্গ রূপে সতত নর্মদার জলে বিরাজমান থাকব। শত সহস্র লিঙ্গের মধ্যে যেগুলির আকৃতি পাকাজাম বা হংসডিম্বের মত হবে, বর্ণ

হবে পাকাজামের মত কিংবা মধুবর্ণ, শ্বেত, নীল ও মরকতের মত দ্যুতিসম্পন্ন, সেইগুলিকে আমার বাণ লিঙ্গরূপ বলে জানবে। অন্যান্য কোটি কোটি লিঙ্গ পূজার যা ফল হয়, একটি বাণলিঙ্গ পূজা করলে তার সমস্ত সুফলই পাওয়া যায়।

মহারাজা বাণের রাজধানী ছিল নর্মদাতটে। প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ বাণ শুধু অসাধারণ শৌর্যবীর্যেরই অধিকারী ছিলেন না, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়—তিনি ছিলেন অসাধারণ শিবভক্ত। মহারাজ বাণের উগ্র শিব-তপস্যায় ভক্তিবশ ভগবান শিবসুন্দর এতই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই 'বাণ' নাম গ্রহণ করে ভক্তের অতুলনীয় ভক্তি ও তপস্যাকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছেন। তাই বাণ শব্দের অর্থও হয়েছে শিব। তিনি বাণ শিবলিঙ্গরূপে স্বতঃই নর্মদার জলে উদ্ভূত হয়ে নিয়ত নর্মদাতে বিরাজমান থাকবেন এ বরও তিনি বানকে দিয়েছিলেন।

শৈবাগমের ঋষি উৎপলাচার্য প্রণীত 'যোগসার' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে ঋষি বাক্যের প্রমাণানুসারে জানতে পারি যে মহারাজ বাণ তাঁর তপস্যার ক্ষেত্র ধাবড়ী কুণ্ডে নিজ হাতে মৃন্ময় শিবলিঙ্গ গড়ে পূজা করতেন এবং নিত্য নর্মদাতে বিসর্জন দিতেন। মহাদেব দর্শন দিলেন তাঁর কাছে, তখন মহারাজ বাণ নিবেদন করেন—

'ক্লিষ্টোঽহং তব দেবেশ লিঙ্গং কৃত্বা দিনে দিনে'।

অর্থাৎ তোমার লিঙ্গ রূপ গড়তে গড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তুমি কৃপা করে আমাকে সুলক্ষণ লিঙ্গ দান কর। মহারাজ বাণের প্রার্থনায় মহাদেব লক্ষ লক্ষ বাণ লিঙ্গ রূপ প্রকট হয়ে এখনও নর্মদার কোলে বিরাজমান আছেন। মহারাজ বাণ কতযুগ আগে যে মহাদেবের বর পেয়েছিলেন তার কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে প্রকৃত বাণলিঙ্গের উৎপত্তিস্থল এই ধাবড়ীকুণ্ড বা ধারাতীর্থ। এই ধারাতীর্থ ছাড়া নর্মদাতটের আর কোথাও এই বাণলিঙ্গের উদ্ভব ঘটে না। পরম শৈব মহারাজ বাণের এই কাহিনী হতেই বোঝা যায়, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করতে করতে তাঁর শিব দর্শন ঘটেছিল। শিবলিঙ্গ পূজা করলেও শিব প্রসন্ন হন, আশুতোষ ভক্তকে দর্শন দান করেন। বাণলিঙ্গ স্তোত্রে আছে—

বাণলিঙ্গ প্রসাদেন নরঃ যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ।

অর্চ্চয়িত্বা বাণলিংগং মোক্ষমাপ্নোতি সত্বরম্।। অর্থাৎ বাণলিঙ্গের প্রসাদে মানুষ যোগী হয়ে যায় এবং বাণলিঙ্গের অর্চনার দ্বারা শীঘ্র মোক্ষ লাভ হয়।

আবার পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজার ফল বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি বলেছেন—

ঐহিকং কিং ফলং মুক্তিরেব করে স্থিত। জাগতিক সম্পদ লাভের কি কথা মুক্তি পর্যন্ত হস্তগত হয়।

পার্থিব শিবলিঙ্গও মহাদেব, বাণলিঙ্গও মহাদেব। নিষ্ঠাভরে পূজা করলে একই ফল লাভ হয়। মহারাণী অহল্যাবাঈ ওঁকারেশ্বরের বিষ্ণুপুরীতে পার্থিব

শিবলিঙ্গ পূজার ব্যবস্থা করে এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে যাঁরা শিবলিঙ্গ সংগ্রহ করতে পারবেন না, তাঁরা মৃন্ময় শিবলিঙ্গ পূজা করেও একই ফল পাবেন।

ইনি হলেন মর্ত্যের শিবকন্যা। এঁর দয়া ও দানের, বিশেষত অনন্য শিবনিষ্ঠার কোন তুলনা হয় না। তাঁর জীবন শোক-তাপে ভরা ছিল কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, যে ঠাকুরের নিত্য উপাসনা করেও যখন এত দুঃখ শোক তখন সে ঠাকুরকে ডেকে লাভ কি? কিন্তু অহল্যাবাঈ ছিলেন প্রকৃত ভক্ত। তিনি জীবনের সকল দুঃখ-শোককে শিবসুন্দরের চরণ-কমলে পুষ্পাঞ্জলির মত সমর্পণ করে শিবচিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তাই দেবী অহল্যাবাঈ-এর দেহান্ত হয়েছিল তাঁর এই প্রিয় মহেশ্বরেই।

তাই মন্দিরের ভিতরে দেওয়ালে তাঁর একটি প্রতিমূর্তি খোদাই করা আছে। সেই মূর্তিতে তাঁর ম্লান গম্ভীর মুখে, ললাটে অজস্র দুঃখ-শোকের ছাপ, সর্বাঙ্গে স্তব্ধ বেদনার ছায়া, সন্নত দুই চোখ, কিন্তু অপার করুণা ও মমতা যেন ঝরে পড়ছে দুই চোখ হতে। হাত দুখানি বুকের কাছে, বাম হাতের উপর ডান হাতটি ন্যস্ত, তাতে একটি শিবলিঙ্গ ধরে রেখেছেন। শিবগতপ্রাণা এই মহাময়ী দেবীমূর্তি যেন কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবের চরণে আর্তি জানাচ্ছেন—

প্রভু! দক্ষিণা লও আমারে
দিবার আমার নাই কিছু গো,
শুধু তুমি আছ
মোর ভাণ্ডারে।।

নর্মদাতে তো বাণলিঙ্গের অভাব নেই। এত থাকতেও সদা শিবপরায়ণা মহিয়সী অহল্যাবাঈ ওঁকারেশ্বরে বিষ্ণুপুরীর ঘাটে অমলেশ্বরের মন্দিরে ২২ জন পণ্ডিত দিয়ে প্রতিদিন ৩৩০০০ পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরি এবং তা পূজা ও বিসর্জনের ব্যবস্থা করে গেছেন। এই পার্থিব শিবলিঙ্গ এবং বাণলিঙ্গের পার্থক্য কোথায়?

নর্মদাতে উদ্ভূত অন্যান্য শিবলিঙ্গের সঙ্গে বাণলিঙ্গের পার্থক্য এই যে যদিও উভয়েই জাগ্রত তবুও বাণলিঙ্গের সামনে স্নান, দান, তপস্যা, জপ-হোম, যাই অনুষ্ঠান করা হোক তার ফল হয় অক্ষয়। তাই অক্ষয় সিদ্ধিলাভ করতে হলে বাণলিঙ্গই বরণীয়। অন্যান্য শিবলিঙ্গ স্থাপনকালে যেমন আবাহন, প্রতিষ্ঠা, জপহোমাদি, নানাবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করতে হয়, কিন্তু বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকালে কোন সংস্কার বা আবাহনাদির প্রয়োজন হয় না।

'যোগসার' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরও জানা যায় যে নর্মদাজলের প্রবল ঢেউ কুণ্ডগাত্রে ধাক্কা খেয়ে বিঘূর্ণিত হচ্ছে, আর তার ফলে আজও বিভিন্ন শিবচিহ্ন নিয়ে নিত্য নূতন বাণলিঙ্গের আবির্ভাব ঘটছে। এইভাবে বাণলিঙ্গ উদ্ভূত হচ্ছে, এ কোন মনুষ্য নির্মিত কারুকলার নিদর্শন নয়, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক মহিমা আছে। ঋষিদের স্পষ্ট ঘোষণা—

অণ্যেষাং কোটিলিঙ্গানাম্ পূজনে যৎ ফলং লভেৎ।

তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গেক পূজনাৎ।।

অর্থাৎ নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে এককোটি শিবলিঙ্গ পূজায় যে ফল পাওয়া যায়, যথোচিতভাবে একটি বাণলিঙ্গ পূজা করলে ঐহিক ও পারত্রিক সেই সব ফলই পাওয়া যায়।

শিব তো মঙ্গলময় দেবতা একথা লোকে শাস্ত্রমুখে শুনে তবেই বলে থাকে, সকলের তো শিবজ্ঞান হয়নি বা সকলের ভাগ্যে শিবদর্শন ঘটেনি। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে কোন শিবলিঙ্গটি পূজা করলে গৃহীর পক্ষে ধর্মার্থ ও সাংসারিক কামনা-বাসনার সিদ্ধি ঘটে, আর কোন শিবলিঙ্গটি পূজা করলে মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ ঘটে। যিনি মোক্ষ দান করেন সেই শিবলিঙ্গ সন্ন্যাসীর পূজনীয়। এজন্য শিবদর্শী তত্ত্বদর্শী ঋষিসমাজ শাস্ত্রে শিবলিঙ্গের বিভিন্ন চিহ্ন নির্দেশ করে তার ফলাফলের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। শিবলিঙ্গের বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে' 'নিন্দলিঙ্গমাহ তত্রৈব' এই অধ্যায়ে কোন শিবলিঙ্গ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় সে সম্বন্ধে কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে—

'শিরসি স্ফুটি বাণে ব্যাধির্মরনমেব চ'—

অর্থাৎ বাণলিঙ্গের শিরোদেশে ফাটা ফাটা চিহ্ন থাকলে সেই শিবলিঙ্গ পূজা করলে ব্যাধির আক্রমণ এমনকি মৃত্যু ঘটে।

'লঘু বা কপিলং স্থুলং গৃহী নৈবার্চায়েৎ ক্বচিৎ'—

অর্থাৎ যে শিবলিঙ্গ হাল্কা পিঙ্গল বর্ণের বা অত্যধিক পিঙ্গল সেই রকম শিবলিঙ্গও গৃহীর পূজা করা উচিত নয়।

অতিস্থুলঞ্চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম্।।

গৃহী বিবর্জয়েৎ তাদৃক তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্।

অর্থাৎ যে সব শিবলিঙ্গ অতিস্থূল, অতিকৃশ কিংবা তাতে যদি কোন অলঙ্কারের চিহ্ন থাকে, গৃহীর পক্ষে তা পরিত্যাগ করা উচিত। এই ধরণের শিবলিঙ্গ মোক্ষার্থীদের পক্ষে শুভ হলেও গৃহীর পক্ষে তা শুভ হবে না।

এখন কি রকম শিবলিঙ্গ গৃহীর পক্ষে মঙ্গলপ্রদ সে সম্বন্ধে 'বীরমিত্রোদয় ধৃত কালোত্তর' নামক প্রাচীন পুস্তকে 'শুভলিঙ্গমাহ' নামক অধ্যায়ে তার বর্ণনা আছে—

অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্খিনাম্'

অর্থাৎ কপিল বা পিঙ্গল বর্ণের (পীতের আভাযুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের) শিবলিঙ্গই অর্থকামী গৃহীকে অর্থদান করে থাকেন। তবে সেই পিঙ্গলবর্ণ যদি গাঢ় হয়, মোক্ষার্থীকে মোক্ষ দান করে থাকেন।

'পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।

তৎ সপীঠমপীঠ্ম বা মন্ত্রসংস্কার বর্জিতম্।।

সিদ্ধি মুক্তিপ্রদং লিঙ্গম্ সর্ব্ববর্ণং সুপীঠগম্।'

—গৃহস্থের পক্ষে সবচেয় মঙ্গলপ্রদ ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ। যোনীপীঠ থাক বা না থাক, মন্ত্র সংস্কার বর্জিত অবস্থাতেও যদি কোন গৃহী ঐ রকম শিবলিঙ্গ পূজা করেন তাতে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

কোন কোন শিবলিঙ্গ গৃহী এবং সন্ন্যাসীদের মঙ্গলজনক তারও বর্ণনা আছে 'হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে'। এই প্রাচীন গ্রন্থে পাই—সেখানে দেবর্ষি নারদ একবার ভ্রমণ করতে করতে এক পরম শিবভক্ত ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণের শিব নিষ্ঠা দেখে তিনি সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে বলেছেন—

'অথ বক্ষ্যামি তে বিপ্র গুহ্যচিহ্নং অতঃ পরম্।
শ্রবণাৎ যস্যা পাপানি নাশমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ।।
মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণ কুণ্ডলিকাযুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈনিষেব্বিতম্।।'

—হে ব্রাহ্মণ! অতঃপর তোমাকে মহাদেবের একটি গোপন চিহ্নের কথা বলছি, যা শ্রবণ করা মাত্রই সমস্ত পাপের নাশ হয়। শিবলিঙ্গটি যদি মধুপিঙ্গল বর্ণের হয় এবং তা কৃষ্ণকুণ্ডল যুক্ত হয়, তবে তাকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে জানবে। সকল সিদ্ধপুরুষের দ্বারা তিনি পূজিত হন।

তিনি সেই ব্রাহ্মণের কাছে শিবলিঙ্গের মঙ্গলময় নাম, আরও কতকগুলি চিহ্নাদির রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন—

'নানাবর্ণসমাকীর্ণং জটাশূলসমন্বিতম্।
মৃত্যুঞ্জয়াহবায়ন্ লিঙ্গম সুরাসুরনমস্কৃত্যম।।'

—নানাবর্ণ রঞ্জিত যে শিবলিঙ্গ এবং তার মধ্যে জটা ও ত্রিশূল চিহ্ন আছে তার নাম মৃত্যুঞ্জয়। যেখানে এই শিবলিঙ্গ বিরাজ করুক না কেন, সুরাসুরগণ অলক্ষ্যে তাঁকে নমস্কার করে থাকেন। যে বাড়িতে এই মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেই বাড়িতে কারও অকালমৃত্যু হয় না।

'শুভ্রাভং পিঙ্গলজটলং মুণ্ডমালাধরং পরং।
ত্রিশূলধরমীশানং লিঙ্গ সর্বার্থ সাধনং।।'

সাদাটে রং এর যে শিবলিঙ্গে পিঙ্গল বর্ণের জটার চিহ্ন, গলদেশে মুণ্ডমালার চিহ্ন এবং ত্রিশূল চিহ্ন রয়েছে, তাঁর নাম ঈশান। ঈশানের অর্চনা করলে সর্বার্থ সিদ্ধি হয়। ঈশানরূপী শিবলিঙ্গের পূজা করলে তিন দিনের মধ্যে মন্ত্রচৈতন্য ঘটে থাকে।

মধুপিঙ্গলবর্ণাভং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্।
শ্বেতপদ্মাসমাসীনং চন্দ্ররেখাবিভূতিষতম্।।
প্রলয়াস্ত্রসমাযুক্তং ত্রিপুরারি সমাহ্বয়ম্।

অর্থাৎ যে শিবলিঙ্গের বর্ণ মধুপিঙ্গল এবং তাতে যদি শ্বেতযজ্ঞোপবীতের চিহ্ন, ত্রিশূল চিহ্ন, উর্দ্ধভাগে অর্ধচন্দ্র এবং তলার দিকে শ্বেতপদ্মের চিহ্ন থাকে, তাহলে সেই বাণলিঙ্গের নাম ত্রিপুরারি। ইনিও সর্বাভীষ্ট প্রদায়ক।

জ্বলৎপিঙ্গং জটাজুটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহন।

কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্বসত্ত্বৈ নিষেবিতম্।।

—এক ধরণের শিবলিঙ্গ আছে যাঁর দিকে তাকালে মনে হয় লিঙ্গের মধ্যে আগুন জ্বলছে, স্পষ্টতঃ অগ্নিশিখা দেখা যায়। এই শিবলিঙ্গ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের হয় এবং কিঞ্চিৎ স্থূলও হয়। সেই শিবলিঙ্গের নাম কালাগ্নিরুদ্র। সকল জীবই এই শিবলিঙ্গের পূজা করতে পারেন।

শুক্লাভং শুক্লকেশঞ্চ নেত্রত্রয়সমন্বিতম্।

ত্রিলোচনং মহাদেবং সর্বপাপপ্রণোদনং।।

—শুক্ল বর্ণের যে শিবলিঙ্গে শুক্লকেশ ও স্পষ্টতঃ ত্রিনয়নের চিহ্ন থাকে, তাঁর নাম ত্রিলোচন। ত্রিলোচন শিবলিঙ্গের যিনি অর্চনা করেন, জন্মার্জিত সমূহ পাপের বিনষ্টি ঘটে।

ত্রিশূলডমরুধরং শুভ্ররক্তার্ধভাগতঃ।

অর্ধনারীশ্বরাহ্বানং সর্বদেবৈরভীষ্টদম্।।

—যদিও প্রতিটি শিবলিঙ্গই তত্ত্বতঃ অর্ধনারীশ্বর কারণ শিবশক্তি সততই অভিন্ন, তবুও অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গের প্রত্যক্ষ স্বরূপ হচ্ছে, এই শিবলিঙ্গের অর্ধেকটা সাদা এবং অর্ধেকটা লালচে রং এর হয়। ভিতরে সুস্পষ্ট ত্রিশূল ও ডমরু চিহ্ন আছে। এঁর পূজা করলে মানুষের আর কথা কি, দেবতাদেরও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। দেবতাদের পূজার্হ এই দেবতা। অধর্নধারীশ্বরের পূজা করার সৌভাগ্য যাঁর ঘটে থাকে, তাঁকে সর্বাভীষ্ট প্রদান করার জন্য সমস্ত দেবতারাই উন্মুখ হয়ে থাকেন।

সূত সংহিতার ঋষি বলেছেন—

'ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।

উমাশংকরয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।'

—শিব ভিন্ন শক্তি থাকেন না, আর শক্তি ছাড়া শিবও থাকেন না। শিব মানেই একত্রে অর্ধনারীশ্বর। যে উমাশঙ্করের ঐক্য দর্শন করে সেই যথার্থ দর্শন করে।

ঈষৎরক্তময়ং কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম্।

মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।।

—যে শিবলিঙ্গ ঈষৎ রক্তাভ, স্থূল, দীর্ঘকায় এবং অত্যন্ত দীপ্তিমন্ত তাঁর নাম মহাকাল। মহাকালের অর্চনায় ধর্ম, অর্থ কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের প্রাপ্তি ঘটে।

এইভাবে দেবর্ষি নারদ সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণের কাছে শিবলিঙ্গের চিহ্ন বর্ণনা করলেন এবং বললেন এই চিহ্নগুলির মধ্যে একটি চিহ্ন থাকলে তাঁরই অর্চনা করলে মঙ্গল হবে।

আমার অন্তরের বিশ্বাস আশুতোষ শিবসুন্দর, সতত মঙ্গলময়। কত জন্মের সাধনা ও সুকৃতি থাকলে তবে মানুষের পুণ্য সঞ্চয়, মোক্ষাবস্থা লাভ হয়। মোক্ষ মানে পরম নিঃশ্রেয়স লাভ। শিব পূজা করলে তা যদি কারও ভাগ্যে ঘটে, সে ত পরম সৌভাগ্য।

সাধারণতঃ আমরা শিবলিঙ্গ দেখলেই তাঁকে বাণলিঙ্গ বলে আখ্যা দিই। কিন্তু এই বাণলিঙ্গেরই অনেক প্রকারভেদ আছে। কারও মনের আসক্তি পূরণের সহায়ক শিবলিঙ্গ পূজা করতে হলে তাঁর পক্ষে সহজ উপায় লক্ষণ ধরে শিবলিঙ্গ নির্বাচন করা। এমন কোন সহজ উপায় থাকলে যার সাহায্যে কোন সাধন ভজন হীন লোকও তাঁর অভীষ্ট পূরণ করার জন্য শিবলিঙ্গ সহজেই নির্বাচন করে নিতে পারেন। তাই তিনি উপরোক্ত চিহ্ন সহকারে এই বাণলিঙ্গ নির্বাচন করতে যারা অপারগ তাদের জন্য শিবাচার্যরা একটি খুব সহজ পন্থা দিয়েছেন।

তুলাদণ্ডের সাহায্যে শিবলিঙ্গটির সমপরিমাণ চাল ওজন করে নিয়ে সেই চাল একটি কৌটার মধ্যে রেখে শিবলিঙ্গের পাশে বসিয়ে ভক্ত এক মনে ভগবান শিবসুন্দরের কাছে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে প্রার্থনা জানাবে। এই বার তুলাদণ্ডের একদিকে শিবলিঙ্গ ও অন্যদিকে সেই ওজন করা চাল রেখে ওজন করলে যদি দেখা যায় চালের ওজন বৃদ্ধি হয়েছে তবে বুঝতে হবে সেই শিবলিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে বাণলিঙ্গ। ঐ বাণলিঙ্গ ঐ ভক্তের কাছে কল্যাণময় এবং অভীষ্ট সিদ্ধিকারী। কিন্তু চালের ওজন কম হলে বুঝতে হবে ঐ শিবলিঙ্গটি ঐ ভক্তের কাছে কল্যাণময় নয়, তাই ঐ শিবলিঙ্গের পূজা অর্চনা বিধেয় নহে।

যদি উভয় বস্তুর ওজন পাঁচমিনিট পরেও অপরিবর্তিত থাকে তবে বুঝতে হবে ঐ শিবলিঙ্গটি অর্চনায় যদিও ভক্তের কোন অনিষ্ট হবে না তবুও ভক্তের কোন অভীষ্ট সিদ্ধিও হবে না।

কিন্তু আজ বিজ্ঞানের যুগে যে যুক্তিবাদী মানুষেরা নিউটনের 'মহাকর্ষের সূত্রকে' অমোঘ বলে মনে করেন তারা এই প্রক্রিয়াকে অবাস্তব বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ঈশ্বর ভক্তদের কাছে বিশ্বাসই যুক্তি। তাই স্মরণাতীত কাল থেকে এই ভক্তিবাদী মানুষগুলি বিশ্বাসের রসে সিক্ত হয়ে পরম কল্যাণময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও উপস্থিতি বার বার উপলব্ধি করেছেন। তাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিশ্বাসের রন্ধ্রপথ ধরে অগণিত মানুষকে উজ্জীবিত করে রেখেছে।